শরীঅতের দৃষ্টিতে বিদআত

ড.মাওলানা মুশতাক আহমদ
খতীব ও শায়খুল হাদীস
তেজগাঁও রেলওয়ে স্টেশন জামে মসজিদ ও
তেজগাঁও রেলওয়ে জামেয়া ইসলামিয়া, ঢাকা

সূচিপত্র

* বিদআতের আভিধানিক বিশ্লেষণ/
* পারিভাষিক অর্থে বিদআত/
* বিদআতের শ্রেণী বিভাগ/
* ‘কুললু বিদআতিন দালালা’ সকল বিদআতই গুমরাহী/
* বিদআত-এর হাকীকত/
* যুগে যুগে বিদআতই শরীঅতকে প্রথম বিকৃত করেছিল/
* বিদআতের পথ দিয়েই ইয়াহূদ নাসারা গুমরাহ হয়েছে/
* রাসূলুলাহ্ সা. শরীঅতে নতুন সংযোজনের কোন কিছু বাকি রেখে যাননি/
* দীন হিফাযতের মৌলিক কাজ দু’টি সুন্নাতের প্রতিষ্ঠা ও বিদআতের প্রতিরোধ/
* মুসলমানদের মধ্যে বিদআতের পথ দিয়েই বিকৃতি অনুপ্রবেশ করবে/
* বিদআত প্রতিরোধ ও সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার মেহনতেও থাকবে একদল ভাগ্যবান/
* মুসলিম সমাজে বছর বছর যুক্ত হবে নতুন বিদআত/
* তিন যুগ পর ছড়িয়ে পড়বে মিথ্যার বেসাতি/
* আফসুস! মুসলমানরা ইয়াহূদ নাসারার তুচছ কাজেরও পুনরাবৃত্তি ঘটাবে/
* আফসুস! বিদআত প্রচারের নেতৃত্ব দিবে আলিমদেরই একটি শ্রেণী/
* সমাজের রন্ধে রন্ধে ঢুকে পড়বে বিদআত/
* এভাবে কিয়ামতের পূর্বে ইসলামের সব শিক্ষা বিদায় নিবে/
* তাই মুসলমান সাবধান ! বিদআত থেকে বেঁচে থাকো/
* সুন্নাতের আমল ও সাহাবীগণের অনুসরণই নাজাতের একমাত্র পথ/
* দীনের কাজে যতটুকু বিদআত ঢুকে ততটুকু সুন্নাত উঠে যায়/
* বিদআত প্রতিরোধের চেতনা ঈমানের লক্ষণ/
* বিদআত থেকে সাধানতার কারণেই আবিদের চেয়ে আলিমের সম্মান বেশী/
* সুন্নাত মোতাবেক সামান্য আমল বিদআতের অজস্র আমল থেকে উত্তম/
* লোকে কি করে সে দিকে কান দিও না, আত্মরক্ষার চিন্তা কর/
* বিদআত দেখতে সুন্দর ভিতরে অন্ধকার/
* বিদআত পালনে শয়তান খুশি হয়/
* বিদআত আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কাজ/
* সাহাবা ও তাবিয়ীন বিদআতকে কখনো প্রশ্রয় দেননি/
* বিদআত পরিহার করে চলা পরহেযগারীর লক্ষণ/
* ইলম ও ইত্তিবায়ে সুন্নাতের প্রসারতা দিয়েই বিদআত দূর করা যায়/
* বিদআত জন্ম নেয় অতি সংগোপনে/
* আকীদা ও আমলের বিদআত/
* বিদআতের প্রচলন দানকারী মহাপাপী/
* বিদআতকারীকে আল্লাহ ও তাঁর নবীগণ লানত করেন/
* বিদআতকারীকে আশ্রয় কিংবা প্রশ্রয় দেওয়া নিষেধ/
* বিদআতকারীর কোন নেক আমল কবুল হয় না/
* বিদআতকারীর সংসর্গ থেকে দূরে থাকো/
* বিদআতকারীকে সম্মান প্রদর্শন করা যায় না/
* বিদআতকারীর তওবা নসীব হয় না/
* বিদআতকারী হাউযে কাউসারের পানি থেকে বঞ্চিত থাকবে/

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

বিদআতের অর্থ ও শ্রেণী বিভাগ

বিদআত-এর আভিধানিক বিশ্লেষণ

বিদআত (بدعة) অর্থ নতুন জিনিস। লিসানুল আরব অভিধানে বলা হয়েছে, আল বুদউ (البدع) অর্থ অভিনব বিষয়। আল্লামা ইবনুস সিক্কীত বলেন, আল বিদআহ অর্থ যে কোন নতুন বিষয়। বিদউন অর্থ এমন কোন জিনিস যা আগে ছিল না, পরে সৃষ্টি হয়েছে কিংবা এমন নতুন উদ্ভাবিত জিনিস যার কোন দৃষ্টান্ত পূর্বে গত হয়নি। এ অর্থ থেকেই মহান আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম আল বাদী (البديع) যার অর্থ হল কোনরূপ নমুনা বা উদাহরণ ছাড়াই নিজ উদ্ভাবনী ক্ষমতাবলে কোন অভিনব বস্তুর সৃষ্টিকারী[১]।

বিদআহ শব্দের অর্থ সম্পর্কে আল্লামা মাজদুদ্দীন ফীরুযাবাদী (মৃ. ৮১৬ হি.) লিখেছেন, বিদআত শব্দটি 'বা' অক্ষরে যেরযুক্ত। এর অর্থ হল এমন কোন নতুন জিনিস যা দীন পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর সৃষ্টি হয়েছে। কিংবা এমন কোন জিনিস যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে কারো খেয়ালখুশি বা খাহিশাত পুরুণ বা কর্মনির্বাহের আকারে প্রকাশিত হয়েছে[২]।

অভিধান তত্ত্ববিধ ইমাম রাগিব আল ইসফাহানী (মৃ.৫০৩ হি) বলেন, আল বিদআহ অর্থ হল কোন যন্ত্র, উপাদান, কাল বা স্থানের সাহায্য গ্রহণ ব্যতিরেকে কোন বস্তুর উদ্ভাবন করা। ইসলামী শরীঅতে আল 'বিদআহ' হল এরূপ কোন নতুন আমল বা নতুন আকীদা বা নতুন কার্য বা নতুন প্রথা- যার সমর্থনে পবিত্র কুরআন-সুন্নায় কোনরূপ দলীল প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও সেটিকে দীন ও শরীঅতের অন্তর্ভূক্ত জ্ঞান করা হয়েছে[৩]।

ইমাম মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর ইবন আবদুল কাদির রাযী লিখেছেন, দীন পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ হওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর তাতে নতুন কোন জিনিস নতুনভাবে সংযোজনের নাম হল বিদআত[৪]।

আল্লামা আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবন উমর আল জামাল আল কারশী লিখেছেন, দীন পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর বাইর থেকে নতুন কোন কিছুর সংযুক্তিকে বিদআত বলে[৫]।

ইমাম নববী বলেন, বিদআত হল প্রত্যেক ঐ জিনিস যা শরীঅতে পূর্ব কোন নমুনা ব্যতিরেকে উদ্ভাবন করা হয়েছে[৬]। উর্দূ ফীরূযুল লুগাত গ্রন্থে বলা হয়েছে, বিদআত হল, দীনের নামে দীনের মধ্যে নতুন কোন আমলের সংযোজন করা, নতুন কোন প্রথা চালু করা।

মোট কথা আভিধানিক অর্থে বিদআত কথাটি ব্যাপকার্থক। এই অর্থে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুসতাফা সা.-এর পরে সৃষ্ট সকল জিনিসই বিদআতের আওতাভুক্ত। চাই সেটি কোন ইবাদত বিষয়ক জিনিস হোক কিংবা মানুষের সাধারণ জীবন যাত্রা বিষয়ক জিনিস হোক তাতে কোন পার্থক্য নেই। আভিধানিক অর্থের এই বিদআত পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। ওয়াজিব যেমন- শিক্ষা দানের জন্য ইলমে নাহব বা ইলমে সরফ ইত্যাদি পড়ানো বা তিলাওয়াতে কুরআনের শিক্ষাদান করা। হারাম যেমন জাবারিয়্যা

---

১. আন নিহায়া, দ্র. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, 'বিদআ' প্রবন্ধ, পৃ. ২২২।
২. আল কামূস, খ. ২, পৃ. ৪।
৩. মুফরাদাতুল কুরআন, পৃ. ৩৭।
৪. মুখতারুস সিহাহ, পৃ. ২৮০।
৫. আস সিরাহ, খ. ২, পৃ. ৩০১।
৬. শরহু মুসলিম, খ. ১, পৃ. ২৮৫।

কাদারিয়্যা ইত্যাদি বাতিল আকীদাপন্থীদের আকীদা ও আমল গ্রহণ করা। মুস্তাহাব যেমন মাদ্রাসা খানকা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা এবং দীনের সহযোগিতার মানসে স্থান কালের চাহিদা অনুসারে নতুন কোন উপায় বা অবলম্বনকে গ্রহণ করা ইত্যাদি। মুবাহ যেমন ফজর নামাযের পর মুসল্লীরা পরপর মুসাফাহা করা ইত্যাদি[৭]।

উল্লেখ্য যে, আভিধানিক অর্থের বিদআত আর হাদীসে বর্ণিত 'শরয়ী বিদআত' এক রকমের নয়। আভিধানিক বিদআত 'আম' ব্যাপকার্থক আর শরয়ী বিদআত 'খাস' বিশেষার্থক। আভিধানিক বিদআতের সকল অংশ গর্হিত নয়। কিন্তু শরয়ী বিদআতের সকল অংশই গর্হিত। এই শরয়ী বিদআত সম্পর্কেই মহানবী সা. ইরশাদ করেছেন 'কুলু-বিদআতিন দালালা' অর্থাৎ সকল বিদআতই বিভ্রান্তি। তারবীজুল জিনান গ্রন্থে স্পষ্ট বলা হয়েছে ;

ان البدعة على قسمين بدعة لغوية و بدعة شرعية فالاول هو المحدث مطلقا عادة او عبادة وهى التى يقسمونها الى الاقسام الخمسة والثانى هو ما زيد على ما شرع من حيث الطاعة بعد انقراض الازمنة الثلاثة بغير اذن من الشارع لا قولا ولا فعلا ولا صريحا ولا اشارة وهى المراد بالبدعة المحكوم عليها بالضلالة

বিদআত দুই প্রকারের। একটি আভিধানিক অর্থের বিদআত ও অপরটি শরয়ী অর্থের বিদআত। প্রথমোক্তটি (আভিধানিক বিদআত) বলতে নতুন সৃষ্ট সব জিনিসকেই বুঝায়। সেটি ইবাদত কিংবা সাধারণ জীবনযাত্রার যে কোন বিষয়কই হতে পারে। এটিই আলিমগণ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করে থাকেন। আর শেষোক্তটি (শরয়ী বিদআত) হল সেই নতুন জিনিস যা শরীঅত কর্তৃক নির্ধারিত করে দেওয়া ধর্মীয় কাঠামোর উপর বর্ধিত (কিংবা হ্রাসকৃত) অংশ হিসাবে সংযোজিত, যা ইবাদত রূপে পালিত হয়, যা খাইরুল করূনের পরে সৃষ্ট এবং যেই সংযোজনের উপর শরীঅতের পক্ষ থেকে কোন রকমের অনুমতি বিদ্যমান নেই, না কথা দ্বারা, না কাজ দ্বারা, না স্পষ্টভাবে, আর না ইশারা ইঙ্গিতে। হাদীসে বর্ণিত বিভ্রান্ত বিদআত বা শরয়ী বিদআত বলতে উপরোক্ত শেষোক্ত বিদআতকেই বুঝানো হয়েছে[৮]।

পারিভাষিক অর্থে বিদআত

পারিভাষিক অর্থে বিদআত বা শরয়ী বিদআত-এর সংজ্ঞা দিয়ে হাদীসের সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার হযরত আলামা বাদরুদ্দীন আইনী র. (মৃ. ৮৫৫ হি.) বলেন,

البدعة فى الاصل احداث امر لم يكن فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم

প্রকৃত অর্থে বিদআত হল এমন নতুন কাজ যা রাসূলুল্লাহ সা. এর সময়ে ছিল না[৯]।

আলামা হাফিয ইবন হাজার আসকালানী র. লিখেছেন,

البدعة اصلها ما احدث على غير مثال سبق وتطلق فى الشرع فى مقابل السنة فتكون مذمومة

বিদআত প্রকৃত অর্থে সেই জিনিসকে বলা হয় যা পূর্ব কোন উদাহরণ বা নমুনা থেকে সৃষ্ট নয়। ইসলামী শরীঅতে বিদআত শব্দটি সুন্নাতের বিপরীতে ব্যবহৃত বিধায় এটি নিন্দনীয়[১০]।

আলামা মুরতাযা যুবায়দী আল হানাফী (মৃ. ১২০৫ হি.) লিখেছেন,

كل محدثة بدعة انما يريد ما خالف اصول الشريعة ولم يوافق السنة

---

৭. মুফতী আযম মাওলানা ফয়জুল্লাহ, ফয়জুল কালাম, পৃ. ৮৩।

৮. আল জুন্নাহ, পৃ. ১৬১। শরয়ী বিদআত ও আভিধানিক বিদআত এর পার্থক্য সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বক্তব্যের জন্য দেখুন সহীহ বুখারীর শরাহ ইরশাদুস সারী, খ. ২, পৃ. ৩৪৪ ; উমদাতুল কারী খ. ৫, পৃ. ৩৫৬ ; সহীহ মুসলিমের শরাহ হাশিয়া নববী, খ.১, পৃ. ২৮৫ ; আল মাদখাল, খ.২, পৃ. ২৫৭।

৯. উমদাতুল কারী, খ. ৫, পৃ. ৩৫৬।

১০. ফতহুল বারী, খ. ৩, পৃ. ২১৯।

'সকল বিদআতই বিভ্রান্তি' হাদীসের অর্থ হল যে, প্রত্যেক সেই জিনিস যা শরীঅত নির্ধারিত উসূল বা নীতিমালা বিরুদ্ধ এবং যা সুন্নাতের অনুকূলে নয়[১১]।

আলামা আবূ ইসহাক গারনাতী র. লিখেছেন,

هى طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد لله سبحانه وتعالى

শরয়ী বিদআত হল দীনের (কাঠামোর) মধ্যে নতুনভাবে সংযোজিত এমন কোন জিনিস বা কোন তরীকা যা দেখতে শরীঅতের মতই দেখা যায় (আসলে শরীঅত নয়) এবং যার উপর আমল করার দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে মহান আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী বেশী পরিমাণে সম্পাদন করা[১২]।

আল্লামা কিরমানী র. বলেন,

البدعة ما لم يكن له اصل فى الكتاب و السنة

শরয়ী বিদআত হল এমন কোন (ধর্মীয়) জিনিস যার কোন মূল উৎস পবিত্র কুরআন ও মহানবী সা.-এর সুন্নাহে বিদ্যমান নেই। আল্লামা শাতিবী আরো বলেন,

ان البدعة الحقيقة التى لم يدل عليها دليل شرعى لا من كتاب ولا من سنة ولا من اجماع ولا من استدلال معتبر عند اهل العلم لا فى الجملة ولا فى التفصيل ولذالك سميت بدعة لانها مخترع على غير مثال سبق

প্রকৃত বিদআত (বিদআতে শরয়ী) হল সেই জিনিস যার সমর্থনে শরীয়অতের কোন দলীল বিদ্যমান নেই। না আল্লাহর কিতাব থেকে, না মহানবী সা. এর সুন্নাহ থেকে, না ইজমায়ে উম্মত থেকে আর না মুহাক্কিক উলামায়ে কিরামের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন কিয়াস থেকে। অনুরূপ শরীঅত থেকে যার প্রতি কোন সমর্থন পাওয়া যায় না, না মোটামুটি ভাবে আর না বিস্তারিত ও খুটিনাটিসহ। বিদআতকে এ কারণেই বিদআত নাম দেওয়া হয়েছে যেহেতু এটি একটি মনগড়া জিনিস, স্বকথিত জিনিস, শরীঅতে এর কোন পূর্বদৃষ্টান্ত নেই।

'শরয়ী বিদআত' সম্পর্কে পরবর্তীকালীন মুহাক্কিক আলিমগণের মধ্যেও প্রচুর গবেষণা পাওয়া যায়। তাঁদের অনেকে সুন্দর সুন্দর সংজ্ঞাও পেশ করেছেন। যেমন প্রখ্যাত গবেষক আলিম হযরত মাওলানা কারীম বখশ (মৃ. ১৩৬৫ হি) লিখেছেন, শরীঅতের পরিভাষায় বিদআত বলতে বুঝায় ধর্মীয় কাজ হিসাবে পালন করা প্রত্যেক সে সব জিনিস যা খাইরুল কুরূনে অবস্থিত হক্কানী মুসলমানদের অধিকাংশের মধ্যে বিদ্যমান পাওয়া যায় না, কিংবা এমন কাজ যে কাজকে তাঁদের যুগে সুন্নাতের খেলাফ বলে অভিমত দেওয়া হয়েছে কিংবা এমন কাজ যা খাইরুল কুরূনের পরে সৃষ্ট তবে তাতে আকীদাগতভাবে অনাবশ্যক জিনিসকে আবশ্যক জ্ঞান করা হয়েছে কিংবা আবশ্যক জিনিসকে অনাবশ্যক জ্ঞান করা হয়েছে[১৩]।

হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী র. লিখেছেন, বিদআত বলা হয় এমন কোন কাজ যার কোন সূত্র বা বুনিয়াদ কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ ও খাইরুল কুরূনের মধ্যে পাওয়া যায় না; অথচ তা দীনী কাজ বা সওয়াবের কাজ মনে করে পালন করা হয়[১৪]।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো খুবই স্পষ্ট। এগুলোর মধ্যে শব্দ ও বাক্যের সামান্য তারতম্য থাকলেও মূল বক্তব্য অভিন্ন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ জালা শানুহুর কিতাব, রাসূলুলাহ সা.-এর সুন্নাহ, সাহাবায়ে কিরামের আমল ও উম্মতে মুসলিমার ইজমা-এর ভিত্তিমূলে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত আকাইদ ও আমলই হল দীন তথা শরীঅত। মহান আল্লাহ এই শরীঅতকে মানুষের জন্য মনোনীত করেছেন। আর এর বাইরে যা কিছু প্রচলিত আছে অথচ এই শতীঅতে নেই কিংবা এই শরীঅতের পরিপন্থি সেগুলোর বাহ্যরূপ ইবাদতের মত দেখা গেলেও সেগুলো শরীঅত নয় বরং সেগুলি প্রত্যাখ্যাত ও গর্হিত বিদআত। এখানে আরো একটি বিষয়

---

১১. তাজুল উরূস, খ. ৫, পৃ. ২৭১।
১২. আল্লামা ইবরাহীম ইবন মূসা আশশাতিবী, আল ইতিসাম, খ. ১, পৃ. ৩।
১৩. হাকীকাতুল ঈমান, পৃ. ৩৮।
১৪. হামাইল শরীফ, পৃ. ৭০২।

লক্ষ্যনীয় যে, হাদীসে বিদআত শব্দটি 'সুন্নাতের বিপরীত' বলে দেখানো আছে। কাজেই যে তরীকা বা যে কাজ রাসূলুল্লাহ সা. থেকে পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে সুন্নাত। পক্ষান্তরে যা রাসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নায় পাওয়া যায় না বা যা তাঁর সুন্নাহ বহির্ভূত তাই হচেছ বিদআত। মহানবী সা. এই বিদআত থেকে বেঁচে থাকার জন্যই বার বার তাকীদ করে গিয়েছেন[১৫]।

মুফতী আযম হযরত মাওলানা ফয়জুলাহ্ রা. বলেন, বিদআত হল দীনের (অবকাঠামোর) মধ্যে এমন নতুন কোন জিনিস বৃদ্ধি করা যা দীনের মধ্যে ছিল না এবং যার উপর দীনের হিফাযতও নির্ভরশীল নয়। এ পর্যায়ের সংযোজিত নতুন জিনিসটি আকীদাগত জিনিসও হতে পারে আবার আমলগত জিনিসও হতে পারে। আকীদাগত জিনিস যেমন খারেজী, রাফেজী, মুতাযিলা, মুরাজিয়্যা প্রভৃতি বাতিল সম্প্রদায়ের গ্রহণকৃত বিশেষ আকীদা ও বিশ্বাস। আমলগত জিনিস যেমন বর্তমান যুগে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত জন্মবার্ষিকী মৃত্যুবার্ষিকী পালন জাতীয় বিভিন্ন বিদআত। আকীদা হোক আর আমল হোক সব ধরণের বিদআতই পরিত্যজ্য। সব ধরণের বিদআতই গুমরাহী। তবে তুলনামূলকভাবে আকীদার বিদআত আমলের বিদআত অপেক্ষা বেশী জঘন্য। কেননা আমলী বিদআত অনেক সময় ব্যক্তিকে কুফরীর পর্যায়ে নিয়ে যায়[১৬]।

বিদআতের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে তিনি আরো বলেন, সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন রসুম রেওয়াজ যেমন খতনার অনুষ্ঠান করা, বিবাহ উপলক্ষে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান ইত্যাদি মন্দ কাজ। এতগুলোও মসুলিম সমাজে সৃষ্ট নতুন প্রথা। এতদসত্ত্বেও এগুলো বিদআতের অন্তর্ভূক্ত নয়। কেননা এ কাজগুলো মুসলমানরা সামাজিক রেওয়াজ হিসাবে করে কিংবা লোকজনের তিরস্কার থেকে বাঁচার জন্য করে কিংবা নামধাম প্রচার বা লোক দেখানোর জন্য করে থাকে। এসব মন্দ কাজ শরীঅতের বিধান মনে করে সম্পাদন করা হয় না বিধায় এগুলো বিদআতের অন্তর্ভূক্ত হয়নি। কেননা বিদআতে পরিণত হওয়ার অন্যতম শর্ত হল কাজটি শরীঅতের বিধান বা সওয়াবের জিনিস জ্ঞান করে সম্পাদন করা[১৭]।

অনুরূপভাবে যে সব নতুন জিনিস দীন ও শরীঅতের হিফাযত ও সংরক্ষণের জন্য করা হয় সেগুলো বিদআত নয়। বরং এ পর্যায়ের জরুরী কাজ যুগে যুগে উদ্ভাবনপূর্বক সম্পাদন করার জন্য শরীঅত তাকীদ রয়েছে। বিষয়টি আরো বিস্তারিত করে এভাবে বলা যায় যে, শতীঅতের অনুমোদিত কাজকর্ম দুই ধরণের। একটি হল সরাসরি ও প্রকৃতভাবে দীনের কাজ যেমন নামায, রোযা, তাসবীহ্, তাহলীল, তিলাওয়াত, যিকর ইত্যাদি। অপরটি হল এমন কাজ যা সরাসরি দীনের অঙ্গ বা আদিষ্ট বিষয় নয় তবে অন্য কোন আদিষ্ট বিষয়ের সাথে এমনভাবে সংযুক্ত হয়ে আছে যে, সেই কাজগুলো ব্যতিরেকে দীনের আদিষ্ট কাজটির সম্পাদন সম্ভব নয়। কাজেই এগুলো সরাসরি দীনের কাজ না হলেও বিল ওয়াসতা দীনের কাজ হিসাবে গণ্য। এ পর্যায়ে আছে দীনী মাদ্রাসা বা মকতব শিক্ষার ব্যবস্থা করা, ইলমে নাহু, ইলমে সরফ ইত্যাদির অধ্যয়ন,

---

১৫. সারকথা হল ;

فالحاصل ان البدعة احداث شيء لم يكن فى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم لا فى زمن الصحابة ولا فى التابعين ولا تبع التابعين لاصراحة ولا دلالة ولا اشارة ولا كناية ولا ملفوظا ولا مستنبطا بنية الثواب مع كون الداعية له فى تلك القرون قال الشيخ عز الدين عبد السلام فى أخر كتاب القواعد البدعة خمسة اقسام اما واجبة كه بدان معرفت آيات واحاديث حاصل كردد وحفظ غرائب كتاب و سنت و ديكر جيزهاء كه حفظ دين و سنت برآن موقوف بود كالاستدلال بالنحو والصرف اللذان يفهم بهما كلام الله ورسوله لان حفظ الشريعة واجب ولا يتأتى الا بذالك فيكون من مقدمة الواجب ومنها تدوين اصول الفقه والكلام واما محرمة كمذهب الجبرية والقدرية والمرجية والمجسمة والرد على هولاء من البدع الواجبة لان حفظ الشريعة من هذه البدع فرض كفاية واما مندوبة اى كل احسان لم يعهد عينه فى عهد النبى كالاجماع على التراويح وبناء المدارس الدينية والرباط والكلام فى التصوف المحمود واما مباحة كالتوسع فى لذائذ المآكل والمشارب والمساكن واما مكروهة كزخرفة المساجد للفخر والمباهات انظر تنظيم الاشتات ص ৯৯ فحاصل الكلام فى البدعة من هذه الاقوال ان ما احدث بعد الازمنة الثلثة المشهود لها بالخير اذا لم يكن له اصل فى الشرع وجعله الناس عبادة فهو بدعة سيئة قبيحة ثم المراد من الاصل هو الدليل الخاص من الادلة الاربعة من الكتاب والسنة والاجماع والقياس وهو لم يوجد فى هذا الاصل صراحة او اشارة او دلالة او اقتضاء او استنباطا كما مر ص ৯৯ قيل البدعة السيئة هى التى ليس لها من الكتاب و السنة اصل وسند ظاهر او خفى ملفوظ او مستنبط كما فى مجالس الابرار ص ১৩১

১৬. ফয়জুল কালাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

১৭. প্রাগুক্ত।

তাসাউফের দীক্ষা দান ইত্যাদি। দীনের যথার্থ সংরক্ষণ এবং দীন চর্চায় পূণর্তা অর্জন এ কাজগুলোর উপর নির্ভরশীল বিধায় এগুলোও বিল ওয়াসতা দীনী কাজ ও সওয়াবের কাজ হিসাবে গৃহীত। এ ধরণের কাজ সলফে সালেহীনের যুগে সরাসরিভাবে বিদ্যমান না থাকলেও শরীঅতের দৃষ্টিতে এগুলোকে বিদআত বলার সুযোগ নেই। এ সব কাজ প্রিয়নবী সা.-এর হাদীসে বর্ণিত শরয়ী বিদআতের আওতাভূক্ত নয়। তবে হ্যাঁ এগুলোকে বিদআত বলতে হলে শরয়ী অর্থে নয় কেবল অভিধানিক অর্থেই 'বিদআত' তথা নতুন জিনিস বলা যাবে। আর আভিধানিক অর্থের সকল বিদআত গর্হিত নয়[১৮]।

বিদআতের শ্রেণী বিভাগ

মুসলিম উম্মাহর পূর্বকালীন ও উত্তরকালীন জমহূর উলামা, ফুকাহা ও মুজতাহিদীনের রায় অনুসারে বিদআতের কোন শ্রেণী বিভক্তি নেই। সকল বিদআতই মন্দ ও গর্হিত। সকল বিদআতই পরিত্যজ্য। তাঁরা প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সা.-এর হাদীসে বর্ণিত 'কুললু বিদআতিন দালালাতুন' কথাকে কোন প্রকার খণ্ডিতকরণ ব্যতিরেকে গ্রহণ করার পক্ষপাতি। তাঁদের মতে বিদআতকে ভাল ও মন্দ দুইভাগে বিভক্ত করা হলে মহানবী সা.-এর হাদীস 'কুললু বিদআতিন দালালাতুন' -এর কোন আবেদনই থাকে না।

কিন্তু উত্তরকালীন কোন কোন আলিম বিদআতকে দুইভাবে বিভক্ত করেছেন। বিদআতে হাসানা (ভাল বিদআত) ও বিদআতে সায়্যিয়াহ (মন্দ বিদআত)। উত্তরকালীন এ আলিমগণ অবশ্য বিদআত শব্দটিকে ব্যাপকার্থক জ্ঞান করে এর আওতায় নতুন উদ্ভাবিত জাগতিক বিষয়াদি, ধর্মীয় ইবাদাত ও ইবাদাতের আবশ্যকীয় উপকরণ ইত্যাদির সব কিছু অন্তর্ভূক্ত রেখেছেন। অতঃপর ব্যাপকার্থক এ বিদআতের অন্তর্ভূক্ত যে সব কাজ মহানবী সা.-এর সুন্নাহ কতৃক সমর্থিত সেগুলোকে 'বিদআতে হাসানা' আর যেগুলো সুন্নাহ কর্তৃক সমর্থিত নয় সেগুলোকে 'বিদআতে সায়্যিয়াহ' বলে মত দিয়েছেন। তাদের মতে কুললু বিদআতিন দালালা অর্থ হল বিদআতে সায়্যিয়াই-এর সবই গুমরাহী। যেমন আল্লামা আবূ নুআইম ইসফাহানী (মৃ. ৪৩০ হি) বলেন,

البدعة بدعتان محمودة ومذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم

বিদআত (অভিনব জিনিস) দুই প্রকার। প্রশংসনীয় বিদআত ও নিন্দনীয় বিদআত। বিদআতের মধ্যে যেটি মহানবী সা.-এর সুন্নাহর সাথে মিলসম্পন্ন সেটি প্রশংসনীয় আর যেটি সুন্নাহের সাথে মিলসম্পন্ন নয়; সাংঘর্ষিক সেটি নিন্দনীয়।

ইমাম বায়হাকী (মৃ. ৪৫৮ হি.) লিখেছেন,

المحدثات ضربان ما احدث يخالف كتابا او سنة او اثرا او اجماعا فهذه بدعة الضلال وما احدث من الخير لايخالف شيئا من ذالك فهذة محدثة غير مذمومة

অভিনব বিষয়গুলো দুই প্রকারের। তম্মধ্যে যেগুলো পবিত্র কুরআন অথবা মহানবীর সুন্নাহ অথবা সাহাবীগণের বক্তব্য অথবা উম্মতের ইজমা-এর সাথে সাংঘর্ষিক সেগুলো গুমরাহী তথা পথভ্রষ্টতার বিদআত। আর যেগুলো উপরোক্ত জিনিসগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক নয় সেগুলোকে নিন্দনীয় বলা যায় না[১৯]।

এ আলিমগণ বিদআত শব্দটি সম্পূর্ণ আভিধানিক দৃষ্টিতে 'নতুন জিনিস' গ্রহণ করেছেন। জমহূর উলামার ন্যায় 'গর্হিত নতুন জিনিস; অর্থে গ্রহণ করেননি। এ জন্য তাঁদের মতে বিদআত শব্দের আভিধানিক অর্থে যেমন কোন খারাবী নেই তেমনি বিদআতের নিজস্ব কোন হুকুমও নেই। সুন্নাতের আলোকেই তার বিধান নির্ধারিত হয়। কাজেই যে বিদআত সুন্নাতের প্রতিকূল ও বিপরীত কিংবা যেটি কোন সুন্নাতকে বিনষ্ট

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।
১৯. আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী, ফতহুল বারী, খ. ১৩, পৃ. ২৫৩।

করে বা হটিয়ে দেয় সেটি বিদআতে সায়্যিয়াহ। আর যে বিদআত কোন সুন্নাতকে বিনষ্ট করে না কিংবা সুন্নাতের অনুকূলে থাকে বা সহযোগিতা করে সেটি বিদআতে হাসানা বলে পরিগণিত।

উপরোক্ত আলিমগণের এ দৃষ্টিকোণ থেকে জাগতিক ও সামাজিক বিবর্তনের ফলে মুসলিম সমাজে যে সকল নতুন কর্ম উদ্ভাবিত হয়েছে যেমন নতুন ধরণের বসবাস পদ্ধতি, আহার্য বিষয়াদি ইত্যাদি যতক্ষন না ইসলামী বিধিবিধান বিরোধী হবে ততক্ষণ পর্যন্ত নিন্দনীয় বিবেচিত হবে না বরং বিদআতে হাসানা বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাহ ও সাহাবীগণের আমল কর্তৃক নির্দেশিত কোন কর্ম যথার্থভাবে পালন করার স্বার্থে কিংবা যুগপোযোগী ভাবে উপস্থাপনের প্রয়োজনে নতুন কোন কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবন করা হলে যেমন- কুরআন তিলাওয়াতের জন্য বিভিন্ন হরকতের আবিস্কার, যুগপোযোগী কায়দায় ধর্মীয় শিক্ষাদান পদ্ধতি উদ্ভাবন ইত্যাদি বিদআতে হাসানা হিসাবে গন্য। পক্ষান্তরে নতুন জিনিস যা সুন্নাহর বিরোধী যেমন কবর পাকা করা, কবরকে মসজিদে পরিণত করা ইত্যাদি বিদআতে সায়্যিয়াহ।

বিদআতের উপরোক্ত বিভক্তিকরণকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলা না গেলেও এই বিভক্তি সম্পূর্ণ ঝুঁকিপূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই। বোধ হয় ঝুকির কারণেই মহানবী সা. হাদীসের মধ্যে 'কুললু বিদআতিন দালালা' বলে বিভক্তি করণের সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন। কেননা ইতিহাস থেকে একথা সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে, উত্তরকালে মুসলিম সমাজে যত বিদআতের আমদানী ঘটেছে সবগুলো বিভক্তির এই চোরাপথ দিয়েই প্রবেশ করেছে। বিদআত সমর্থকরা সব সময় নিজেদের খেয়ালখুশির দ্বারা সৃষ্ট বিদআতকে প্রথমত বিদআতে হাসানা বলে সমাজে চালু করেন। তারপর কুরআন কিতাব ঘেটে উপযুক্ত অনুপযুক্ত উদ্ধৃতি ও হাশিয়া সংযুক্ত করে দিয়ে সেটি প্রতিষ্ঠিত করেন। সাধারণ মানুষ শুধু বিদআতে হাসানা শব্দটির কারণে সেটি গ্রহণ করে ফেলে। অথচ প্রকৃতভাবে এটি বিদআতে হাসানার সংজ্ঞায় পড়ে কিনা তা তলিয়ে দেখার সুযোগ তাদের নেই। আর তলিয়ে দেখার জন্য কেউ অগ্রসর হলেও দেখা যায় যে, বিদআত সৃষ্টিকারী আলিম বিদআতে হাসানার এমন এক সংজ্ঞা পেশ করে বসেন যে, সেই সংজ্ঞার আলোকে শুধু তার আবিস্কৃত বিদআত কেন, আকীদা বিষয়ক বড় বড় ঘৃণিত বিদআতকর্মও শরীঅতের অবকাঠামোর মধ্যে ঢুকে পড়ে। এমতাবস্থায় সেই আলিমের পেশকৃত সংজ্ঞাটি কতটা যুক্তিযুক্ত এবং উসূলে ফিকহ ও উসূলে ইজতিহাদ কর্তৃক কতটা সমর্থিত তা নিরূপন করা সাধারণ মুসলমান তো নয়ই সাধারণ পর্যায়ের কোন আলিমের পক্ষেও সুকঠিন। বিদআতে হাসানার এই সংজ্ঞা বিকৃতির পথ দিয়েই কোন কোন বিদআতী আলিম মাযার বা পীরের কদমে সিজদা করা জায়িয বরং কেউ কেউ তো ওয়াজিব বলেও ফতওয়া আবিস্কার করছেন। নাউযু বিল্লাহ।

বিদআতের হাসানার এই শিরোনাম বিভিন্ন লোকদের হাতে এভাবে অপব্যবহার শুরু হলে পরবর্তীকালীন মুহাক্কিক আলিমগণ এই পরিভাষার আরো সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করেন। যেন শব্দটির আড়ালে নানা রকমের বিদআত জন্ম নেওয়ার সুযোগ না থাকে। যেমন আলামা ইবন রাজাব, হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী, হযরত মুফতী সারফারায খান সফদর প্রমুখ লিখেছেন,

বিদআতে হাসানা হলো দীন সম্পর্কিত সেই কাজ যা সৃষ্টি হওয়ার প্রতিবন্ধক (مانع) মহানবী সা.-এর পরে সরে গিয়েছে কিংবা যার প্রয়োজন ও কারণ (سبب) পরবর্তীকালে দেখা দিয়েছে এবং কিতাব সুন্নাহ ইজমা বা কিয়াস থেকে তার বৈধতার সমর্থন মিলে। এই বিদআতকে বিদআতে লুগাবী বা আভিধানিক অর্থের বিদআত বলা যায়। শরীঅতে এ বিদআত নিন্দনীয় নয়।

পক্ষান্তরে যেই বিদআত কর্মের প্রয়োজন ও কারণ মহানবী সা.-এর মুবারক যুগেও বিদ্যমান ছিল কিন্তু মহানবী সা. সেটি দীনী কাজ হিসাবে সম্পাদন করেননি এবং সাহাবা তাবিয়ীন ও তাবি তাবিঈন সেটি মহানবী সা.এর প্রতি তাঁদের অপরিসীম মুহাব্বত ও ভালবাসা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সম্পাদন করেননি সেটি হল বিদআতে সায়্যিয়াহ বা বিদআতে শরঈয়্যা। এই বিদআত সকল অবস্থায় নিন্দনীয় ও গর্হিত। তবে লক্ষ্যণীয় যে, মুজাতাহিদ হিসাবে স্বীকৃত নয় এম কোন ব্যক্তির ইজতিহাদ বিশেষত এই যামানার কেউ কোন বিদআতকে 'হাসানা' বলে ইজতিহাদীভাবে সাব্যস্ত করলে তা ঠিক হবে না। নিসাবুল ফিকহ গ্রন্থে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, বিদআতে হাসানা হল সেই বিদআত যাকে অতীতের স্বীকৃত মুজতাহিদগণ বিদআতে হাসানা বলে অভিমত দান করে গিয়েছেন। পক্ষান্তরে কোন লোক যদি ইজতিহাদের সুযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার এই

যুগে কোন জিনিসকে বিদআতে হাসানা বলে দাবী করেন তা'হলে বুঝতে হবে যে, নিঃসন্দেহে তিনি সত্য ও ন্যায়ের বিপরীতে আছেন কিংবা তিনি কোন গলত ধান্ধায় লিপ্ত হয়েছেন। কেননা মুসাফফা গ্রন্থে আছে, আমাদের এই যুগে প্রচলিত সকল বিদআতই গুমরাহী।

এ আলোচনা থেকে আরো স্পষ্ট হচেছ যে, বিদআতে হাসানা বলতে কেবল সেই জিনিসকেই বুঝাবে সেগুলোর মধ্যে আইম্মায়ে মুজতাহিদ থেকে কারো না কারো ইজতিহাদী রায় বিদ্যমান আছে। তা ছাড়া এই ইজতিহাদ ও কিয়াস কেবল সে সব হুকুম ও মাসআলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে কোন স্পষ্ট নস বিদ্যমান নেই এবং নবীযুগে বা খাইরুল কুরূনের সময় জিনিসটির প্রয়োজন ও সবাব (কারণ) বিদ্যমান ছিল না বরং প্রয়োজন দেখা দিয়েছে পরবর্তী সময়ে[২০]।

'কুললু বিদআতিন দালালা' সকল বিদআতই গোমরাহী

জমহূর ফুকাহা ও মুজতাহিদীন তথা ইমাম আযম আবূ হানীফা রহ. ইমাম মালিক ইবন আনাস রহ. ইমাম আহমদ ইবন হামবল রহ. প্রমুখের মতে বিদআতকে বিভক্ত করে হাসানা ও সায়্যিআহ তথা একাংশকে ভাল ও অপর অংশকে মন্দ বলা আদৌ ঠিক নয়। (কারণ বিদআত হল পায়খানা সাদৃশ। পায়খানার কোন অংশই ভাল নয়, না উপরের অংশ আর না নীচের অংশ) তাঁরা বলেন, সালাত (নামায) শব্দের যেমন দুটি অর্থ আছে। একটি আভিধানিক অর্থ ও অপরটি পারিভাষিক বা শরয়ী অর্থ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের যেখানে যেখানে সালাত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সর্বত্র এর পরিভাষিক ও শরয়ী অর্থই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সেখানে সালাতের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা হলে তা নিসন্দেহে গুমরাহী হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে বিদআত শব্দটিরও দুটি অর্থ আছে। একটি আভিধানিক ও অপরটি পারিভাষিক। হাদীসে বর্ণিত বিদআত শব্দ দ্বারা পারিভষিক অর্থই উদ্দেশ্য হবে। পারিভাষিক অর্থের এই বিদআতের সবই গুমরাহী। সবই পরিত্যাজ্য। তাতে হাসানা বলতে কিছু নেই। বরং হাসানা ও সায়্যিয়াহ বলে বিদআতকে বিভক্ত করা প্রকারান্তরে মহানবী সা. এর স্পষ্ট ঘোষণা 'কুললু বিদআতিন দালালা- সব বিদআতই গুমরাহী' এর বিপরীতে নিজ অভিমত দাঁড় করানোর দুসাহস দেখানো বৈ কিছুই নয়। আর পয়গাম্বরের ঘোষণার বিপরীতে নিজ অভিমত দাঁড় করানো কোন মুসলমান থেকে হতে পারে না। এ কারণে জমহূর উলামার মতে বিদআতকে বিভক্ত করা সম্পূর্ণ অনুচিত। তাঁদের মতে দীনের মধ্যে নতুন কোন কিছুর উদ্ভাবনই বিদআত। আর সকল বিদআতই হল পথভ্রষ্টতা ও গুমরাহী। বিদআতের কোন অংশ হাসানা হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তাছাড়া বিদআতের কোন অংশ যদি হাসানা হতো তাহলে পয়গাম্বর সা. অবশ্যই তা নিজে জানতেন ও উম্মতকে বলে দিয়ে যেতেন। তিনি উম্মত থেকে তা কখনোই লুকিয়ে রাখতেন না। তাই ইমাম মালিক স্পষ্ট ভাষায় বলেন;

من ابتدع فی الاسلام بدعة یراها حسنة فقد زعم ان محمدا قد خان فی الرسالة لان الله تعالی یقول الیوم اکملت لکم
دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فما لم یکن یومیذ دینا فلا یکون الیوم دینا

যদি কেউ ইসলামের মধ্যে কোন বিদআত সংযোজন করে এবং মনে করে যে, এই বিদআতটি হাসানা তথা ভালকর্ম; তাহলে বুঝতে হবে যে, সে ধারনা করে নিয়েছে যে, নিশ্চয় হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সা. রিসালতের দায়িত্ব পালনে খিয়ানত করেছেন। (অর্থাৎ তিনি রিসালতের দায়িত্ব পুরাপুরিভাবে আদায় করেননি বরং কিছু বাদ দিয়ে গিয়েছেন যা এখন পূর্ণ করা হচ্ছে। অথচ এমনটি হওয়া কখনোই সম্ভব নয়, এই ধারণা অনুসারে প্রকান্তরে নিজকে ক্ষুদ্র নবী বলে দাবী উত্থাপনেরও ইশারা বুঝা যায়) কেননা আল্লাহ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেন, আজ আমি তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসাবে মনোনীত করলাম। (সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৩) কাজেই যেসব জিনিস তখন দীনের অংশ ছিল না সেগুলো পরে বর্তমানে দীনের অংশ হতে পারে না[২১]।

২০. মুফতী সারফরাজ খান, রাহে সুন্নাত, প্র. ১০১।
২১. আল্লামা ইবরাহীম ইবন মূসা আশ শাতিবী, আল ইতিসাম, খ. ১, পৃ. ১১৫।

জমহূর উলামার মতে কোন জিনিস বিদআত কি বিদআত নয় তা পর্যালোচনা করতে হলে প্রথমেই দেখতে হবে যে জিনিসটির ক্ষেত্র কি? জিনিসটির ক্ষেত্র যদি জাগতিক কোন কিছু হয় তাহলে সেটি বিদআত কিনা তা খোজাখুজি করা নিস্প্রয়োজন। হ্যাঁ, ক্ষেত্রটি যদি দীন ও ইবাদত বিষয়ক হয় তখন সেটি সুন্নতের খেলাফ নতুন কিছু হলে বিদআত বলে গন্য হয়। এই বিদআতের কোনটিই ভাল হতে পারে না। দীন ও ইবাদতের বাইরে জাগতিক বিভিন্ন নতুন নতুন জিনিস বা নবতর আবিস্কারের সাথে শরয়ী বিদআতের কোন সম্পর্ক নেই। মহানবী সা.-এর ওফাতের পরে জগতে জাগতিক জীবন যাত্রার যে সব নতুন জিনিস সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোর হুকুম শতীঅতের সাধারণ বিধান যা ফিকহের মধ্যে আছে সে অনুসারে জায়িয বা নাজায়িয বলে নির্ণিত হবে। তাই জগতের নতুন নতুন এ সব জিনিসকে বিদআতের আওতায় এনে বিদআতকে হাসানা ও সায়্যিয়ায় বিভক্ত করা সম্পূর্ণ বাতুলতা মাত্র। জাগতিক নতুন বিষয়াদি বিদআত এর আওতায় আসার সুযোগই নেই। প্রিয়নবী সা. একখানা সহীহ হাদীসে বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করে দিয়েছেন। হাদীসখানা নিম্মরূপ;

عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخارى ومسلم

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের এই দীনের মধ্যে কোন নতুন জিনিসের অবতারন করে সে পরিত্যজ্য[২২]।

এ হাদীসে 'ফী আমরিনা' (আমাদের এই কাজের মধ্যে অর্থাৎ দীনের মধ্যে) বাক্যাংশ লক্ষ্যণীয়। এই বাক্যাংশের দ্বারা বুঝা যাচেছ যে, শরয়ী বিদআতের ক্ষেত্র হল দীন ও ইবাদত। জাগতিক নতুন উদ্ভাবিত বিষয়াদি শরয়ী বিদআতের ক্ষেত্র নয়। হাদীসখানার কোন কোন বর্ণনায় 'ফী দীনিনা' শব্দের উল্লেখও পাওয়া যায়। তাতে এ দাবী আরো জোরালো ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই বুঝা যায়, যারা বিদআতকে জাগতিক নতুন বিষয়াদিকে অন্তর্ভূক্ত করে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করতে চান এবং সেই অন্তর্ভুক্তির আড়ালে বিদআতকে হাসানা ও সায়্যিআহ নামে বিভক্ত করতে উৎসাহী তাদের বক্তব্য সহীহ হাদীসের অনুকূলবর্তী নয়, বরং সম্পূর্ণ বিপরীত।

জমহূরের রায় অনুসারে ইসলামী শরীঅতে বিদআত শব্দটি 'আপাদমস্তক জুড়ে একান্ত গর্হিত ও একান্ত নিন্দিত কাজ' অর্থে ব্যবহৃত। বিদআত বললেই বুঝতে হবে যে, এটি আগাগোড়া সম্পূর্ণ একটি খারাপ জিনিস। কাজেই এমন জনিসকে ভাল ও মন্দ দুই ভাগে বণ্টন করা যায় না। তাই দেখা যায় হাদীস শরীফে কোন জিনিসকে মন্দ বুঝানোর জন্য শুধু 'বিদআত' বলেই যথেষ্ট জ্ঞান করা হয়েছে। এর সঙ্গে সায়্যিআ, মন্দ, খারাপ বা বর্জনীয় এ জাতীয় কোন নিন্দাবাচক বিশেষণ সংযুক্ত রাখা হয়নি। অর্থাৎ মহানবী সা. কোন জিনিসকে গর্হিত প্রমানিত করার জন্য জিনিসটি বিদআত এতটুকু বলাই যথেষ্ট বিবেচনা করেছেন। মহানবী বিদআত শব্দটির সাথে হাসানা বা সায়্যিআহ যুক্ত করার দরকারই বোধ করেননি। অনুরূপভাবে সাহাবীগণের অসংখ্য বর্ণনায় দেখা যায় যে, তারা যখনই কোন কাজকে শুধু বিদআত বলেছেন তখনই শ্রোতা বুঝেছেন যে, কাজটি নিন্দনীয় ও বর্জনীয়। তাতে হাসানা কি সায়্যিআহ সে প্রশ্ন কেউ উত্থাপন করেননি। অতএব বাস্তবিক ভাবেই বিদআতের যদি শ্রেণীবিভক্তি থাকতো তাহলে মহানবী সা. কিংবা সাহাবীগণ শুধু বিদআত বলেই মন্দ বুঝাতেন না। অনুরূপে শ্রোতারাও শুধু বিদআত শব্দ শুনেই মন্দ জ্ঞান করতেন না। বরং প্রশ্ন করতেন যে, বুঝলাম জিনিসটি বিদআত কিন্তু ব্যাখ্যা করে দিন যে, এটি ভাল (হাসানা) বিদআত না খারাপ (সায়্যিয়াহ) বিদাআত?

রাসূলূলাহ সা.-এর হাদীসে কোথাও বিদআত শব্দের বিশেষণ হিসাবে হাসানা শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায় না। কোন বদআতকে মহানবী সা. হাসানা কিংবা ভালো বলেননি। সাহাবীগণও সর্বদা বিদআত শব্দকে নিন্দা ও ঘৃণার অর্থে ব্যবহার করেছেন। এমনকি তাঁরা বিদআতকে নিন্দাজনক বুঝানোর জন্য সঙ্গে সায়্যিআহ শব্দে বিশেষণও যুক্ত করতেন না। এ সবের কারণ ছিল যে, তাঁদের সকলের দৃষ্টিতে বিদআত

২২. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম, সূত্র ঃ মিশকাত, পৃ. ২৭।

শব্দটি ছিল শরীঅতের দৃষ্টিতে সর্বৈব একটি নিন্দাজ্ঞাপক শব্দ। তাতে হাসানা বা ভালো এর কোন অংশই নেই।

উত্তরকালীন আলিমগণের মধ্যে জমহূর উলামার উপরোক্ত অভিমতের সবচেয়ে বলিষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন উপ-মহাদেশের শ্রেষ্ঠ বুযর্গ আলিম হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.(৯৭১-১০৩৪ হি.)। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বিদআতকে শ্রেণীবিভক্ত করার বিপক্ষে রায় দেন। মাকতূবাত শরীফে তিনি লিখেছেন,

কোন কোন আলিম বলেন যে, বিদআত দুই প্রকার। হাসানা ও সায়্যিআহ। হাসানা এমন বিদআত যা রাসূলুল্লাহ সা. বা সাহাবীগণের যুগে যদিও ছিল না তবে এটি কোন সুন্নাতকে উঠিয়ে দেয় না। আর বিদআতে সায়্যিআহ হল এমন বিদআত যা কোন সুন্নাতকে উঠিয়ে দেয়। এ ফকীর (হযরত মুজাদ্দিদ রহ.) বিদআত তা হাসানা হোক কিংবা সায়্যিআহ কোনটির মধ্যেই নূর অবলোকন করে না। বরং উভয়টির মধ্যে সে শুধু অন্ধকারই দেখতে পাচ্ছে। মনে রেখ, বিদআতীদের কোন কর্ম বাহ্যিকভাবে চাকচিক্যময় দেখা গেলেও তুমি গভীরভাবে তাকালে দেখবে তাতে কোন নূর নেই তাতে দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতি ও লজ্জিত হওয়া ব্যতীত অন্য কিছু নেই[২৩]।

বিদআত-এর হাকীকত

বিদআতের হাকীকত ও মূলতত্ত্বটি কি এবং বিদআতকে শরীঅতে এতটা গর্হিত বলে দেখানো হয়েছে কেন- সে মর্মে সম্মানিত আলিমগণ প্রচুর গবেষণা করেছেন। তাঁদের বক্তব্যের সারকথা হল যে, হাদীসে সকল বিদআতই গুমরাহী- এ কথা স্পষ্ট বলা আছে। বুঝা গেল বিদআত বড় ধরনের পাপ ও গুনাহের কাজ। এখন বিবেচ্য বিষয় হল যে, এ গুনাহ ও গুমরাহীর প্রতিক্রিয়া কি? এবং এর শেষ পরিনাম কি? তাছাড়া অন্যান্য পাপ ও গুনাহের সাথে বিদআতের পাপ ও গুনাহ-এর পার্থক্য কোন জায়গায় ?

উল্লেখ্য, বিদআত হল এমন এক পাপ যা কিনা শরীঅতের দেহ তথা অবকাঠামোর মধ্যে আঘাত হানে। অবকাঠামোর বিকৃতি ও ক্ষতি সাধন করে। শরীঅতের হুকুম মত আমল করতে না পারা কিংবা আমল করতে গিয়ে কোন ত্রুটি করে ফেলা গুনাহের কাজ। আবার বিদআত সৃষ্টি করা বা বিদআত পালন করাও গুনাহের কাজ। এই দু'রকম গুনাহের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য আছে। বেআমল বা ত্রুটিযুক্ত আমলের কারণে মুসলমান নিজে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, নিজে নিজের উপর জুলম করে। নিজের উপর জাহান্নামকে ওয়াজিব করে তোলে। পক্ষান্তরে বিদআত করার দ্বারা সে যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয় নিজে তেমনি ক্ষতিগ্রস্থ করে আলাহর দেয়া ইসলাম ও ইসলামের অবকাঠামোকে। আরো বড় কথা হল যে, বিদআত করার দ্বারা আহত হয় স্বয়ং মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ সা. এর পবিত্র হৃদয় ও তাঁর সুন্নাহ। উম্মত হয়ে পয়গাম্বরের হৃদয়কে আঘাতে আঘাতে খান খান করা কত বড় জঘন্য কাজ ? নাউযু বিলাহ। কোন সন্দেহ নেই যে, যেই গুনাহ দ্বারা কোন মুসলমান ব্যক্তিবিশেষ নিজে ক্ষতিগ্রস্থ হয় সে গুনাহ থেকে অধিকতর জটিল ও জঘন্য হল ঐ গুনাহ যে গুনাহ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয় আল্লাহর দেয়া ইসলাম এবং আহত হয় মহানবী সা.-এর পবিত্র অন্তর।

বিদআত হল শরীঅতকে বিকৃত করার চোরাপথ। কেননা এটি আলাহ জালা শানুহুর নির্ধারণকৃত শরীঅতের অঙ্গহানি ঘটায়। ধর্ম হিসাবে ইসলামের হুকম আহকাম, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, চিত্র স্বরূপ, আকার আকৃতি কি হবে কি না হবে, কোন কাজটি ইবাদত বলে গন্য আর কোনটি গন্য নয়, আবার ইবাদতের কাজটিও কে কখন কোথায় কিভাবে পালন করবে- এগুলোর অবকাঠামো, সীমানা ও বিধিবিধান ইত্যকার সবকিছু নির্ধারণ করার অধিকার একমাত্র আলাহ জালা শানুহুর। তিনিই এগুলো তাঁর প্রিয় পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মদ সা. এর মাধ্যমে ঠিক করে দিয়েছেন। এই অবকাঠামোর একমাত্র তিনিই নির্মাতা। তাঁর নির্মাণ পুষ্ঠ-পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ। এটি সর্বকালের সর্বপ্রকার সংস্কার সংযোজন বা বিয়োজনের উর্ধে। মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারণকৃত অবকাঠামোর নামই শরীঅত ও সুন্নাহ। এ শরীঅত সর্বপ্রকারের হস্তক্ষেপের উর্ধে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তাতে হস্তক্ষেপের অধিকার রাখে না। এমতাবস্থায় কোন মানুষ কোন আলিম কোন পীর কিংবা কোন সমাজ

২৩. মাকতূবাত শরীফ, বঙ্গানুবাদ শাহ মোহাম্মদ মুতী আহমদ আফতাবী, খ. ১, মাকতুব নং-১৮৬, পৃ. ৬২-৬৩।

যদি তাতে নতুন ভাবে হস্তক্ষেপ পূর্বক আলাহ্‌র নির্ধারিত রূপরেখা থেকে কোন অংশকে হ্রাস করে, কিংবা তাতে নতুন কোন জিনিস গোপনে ঢুকিয়ে দেয় কিংবা আলাহ্‌র নির্ধারিত সীমানার মধ্যে কোন হেরফের ঘটায় তা হলে তা হবে মহান আল্লাহর নির্মারণকৃত অবকাঠামোর বিকৃতি সাধন। তা হবে আল্লাহর কর্তৃত্বের উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ যা নিঃসন্দেহে অমার্জনীয় অপরাধ। হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ্‌ সা.-এর ওফাতের পর শরীঅতের ভিতর বিদআত তথা ইবাদতের কোন নতুন পদ্ধতি সৃষ্টির দ্বারা এহেন জঘন্য হস্তক্ষেপ ঘটে যায় বলেই শরীঅতে বিদআতকে এতটা গর্হিত ও এতটা ধিকৃত বলে দেখানো হয়েছে।

উল্লেখ্য বিদআত হল সুন্নাহর নকল রূপ। জগতে প্রত্যেক ভাল জিনিসের যেমন নকল বের হয়ে থাকে বিদআতও তদ্রুপ। সুন্নাহ হল আসল আর বিদআত হল তার বহিরাবরণ হরনকারী নকল। সুন্নাহ হল মালিক আর বিদআত হল চোর। নকল নিজে সম্পূর্ণ ভূয়া অথচ আসলের বহিরাবরণ দ্বারা মানুষকে প্রতারিত করে কোন সন্দেহ নেই বিদআতও তেমনি একটি জিনিস। এই সুন্নাহর বহিরাবরণ দ্বারা বিদআত যুগে যুগে মানুষের প্রতারিত করে আসছে। নকল সকলই। নকল দ্বারা আমলী যিন্দেগীতে সেই ফলাফল অর্জিত হয় না যা আসল দ্বারা সম্ভব। বরং ক্ষেত্র বিশেষে নকল মাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নকল ঔষধ সুস্থতার নিআমত দান করতে পারে না বরং মৃত্যু ডেকে আনে। বিদআতও তদ্রুপ। এটি ব্যক্তির আমলনামায় সওয়াব সৃষ্টি করে না বরং তাকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়। শরীঅত ও সুন্নাহর উপর আমল করার অনিবার্য ফল হল আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সন্তুষ্টি লাভ ও নাজাত প্রাপ্তি। বিদআত এই শরীঅতের নকলরূপ হওয়ার কারণে তা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নাজাত প্রাপ্তি তো নয়ই বরং অনেক সময় এই বিদআত ব্যক্তিকে শিরকের মধ্যে নিক্ষেপ করে এবং তার দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ করে দেয়।

গবেষক আলিমগণ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, বিদআত হল শিরকের প্রবেশদ্বার তথা দুয়ার। এই প্রবেশদ্বার দিয়েই শিরকের জগতে প্রবেশ করতে হয়। শিরক হল জঘন্যতম গুনাহ। শিরকের কারণে ব্যক্তি মুশরিক হয়ে যায়, বেঈমান হয়ে যায়। এই শিরকের প্রথম ধাপই হল বিদআত। মানুষ প্রথমতঃ সুন্নাহ ছেড়ে বিদআতে লিপ্ত হয়। তারপর বিদআত থেকে শিরকের জগতে নিমজ্জিত হয়। আলিমগণ আরো বলেন যে, কোন মুসলমান চট করেই মুশরিক হয় না, হতে পারে না। শিরকের এই অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে হলে তাকে প্রথম পর্বে বিদআতের সিঁড়িগুলো অতিক্রম করে আসতে হয়। ইসলামে শিরক যেমন নিষিদ্ধ তেমনি শিরকের প্রবেশদ্বার মাড়ানোও নিষিদ্ধ। উল্লেখ্য শিরকের করাল গ্রাস থেকে মানবতার উদ্ধার করা ও রক্ষা করার জন্যই যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ তাবলীগ করে গিয়েছেন। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা. আজীবন সংগ্রাম করে ধর্মের বিশাল আঙ্গিনা থেকে শিরকের এই বিষবৃক্ষ মূলোৎপাটিত করে গিয়েছেন। তারপর এ দুষ্ট শিরক যেন পুনরায় ইসলাম ও মুসলমানকে গ্রাস করে নিতে না পারে সে জন্য তিনি শিরকের প্রবেশদ্বার বিদআতকে 'পরিত্যজ্য' ঘোষণা করে শিরকের দুয়ার কঠিনভাবে বন্ধ করে দেন। তাছাড়া এ দুয়ার পরবর্তি সময়ে যেন কোনভাবেই খুলে যেতে না পারে সে লক্ষ্যে বিদআত প্রতিরোধে তিনি উম্মতকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করে যান।

আলিমগণ আরো বলেন, সুন্নাহ যেমন দীন-শরীঅতের অবকাঠামোর এক একটি অঙ্গ তেমনি বিদআত হল দালালত ও বিভ্রান্তি রাজ্যের এক একটি অংশ। সুন্নাহর পরিণাম হল নূর ও হিদায়াত। পক্ষান্ত রে বিদআতের পরিণাম হল অন্ধকার ও গুমরাহী। সুন্নাহ সৃষ্টি হয়েছে নবী-সাহাবীগণের আমল ও আল্লাহ জাল্লা শানুহুর ওয়াহী থেকে আর বিদআত সৃষ্টি হয় জাল-জালিয়তকারী লোকদের ধাপ্পাবাজী, কারসাজি ও ইবলীস-শংয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে। সুন্নাহর উপর আমল করার দ্বারা ব্যক্তির মাঝে তাকওয়া ও দীনদারী বৃদ্ধি পায়। পরিনামে তার উপর আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল খুশি হন। পক্ষান্তরে বিদআত করার দ্বারা ব্যক্তির মাঝে ক্রমে বৃদ্ধি পায় পাপের অন্ধকার আর তার আপাদমস্তকে বিস্তার লাভ করে বিভিন্ন বিভ্রান্তি ও গুমরাহীর জাল। পরিনামে খুশি হয় তার নাফস, খুশি হয় ইবলীস শয়তান। নাউযুবিলাহ্‌।

ইবলীস গোড়া থেকেই বদ্ধপরিকর হয়ে আছে যে, কি করে আদম সন্তানকে গুমরাহ করা যায়, কিভাবে তাদের শ্রম পণ্ড করে তাদের ব্যর্থ করা যায়। ইবলীস জানে, মুসলমানকে সরাসরিভাবে শিরক কিংবা ধর্মহীনতার দাওয়াত দিয়ে সে কখনোই গিলাতে পারবে না। তাই সে কূটকৌশলের আশ্রয় নিল। সে ফন্দি তৈয়ার করল যে, সে নিজ মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে মুসলমানকে আহবান করবে দীন শরীঅতের

শিরোনামে বরং ইবাদতের শিরোনামে আর মুসলমানরা হাজির হওয়ার পর তাদেরকে সরবরাহ করবে খালিস বিদআত ও বিভ্রান্তি। নাম থাকবে শরীঅতের কাজ হবে শয়তানের। নাম দেখে মুসলমান তা খুশিতে খুশিতে লুফে নিবে আর পরিণামে হবে সে সম্পুর্ণ ব্যর্থ। ইবলীসের এ অপকৌশলের বাস্তবতাই হল যুগে যুগে সমাজের বিদআত-চর্চা। যেমন পরিকল্পনা তেমন কাজ। লোকেরা এখন বিদআতকে ইবাদত ও সওয়াবের কাজ মনে করে খুব খুশিতে গ্রহণ করছে অথচ এ কাজ দ্বারা সে তারই প্রিয় শরীঅতের দেহে ছুরি চালিয়ে মহান শরীঅতের বিকৃতি ঘটাচেছ। তারা বিদআতকে দীনদারী, দীনচর্চা ও বুযর্গী হিসাবে পালন করছে অথচ তা দ্বারা সে গুনাহের অতল তলে তলিয়ে যাচেছ। সমাজের লোকজন লোকজন থেকে এমন সহযোগিতা পেয়ে ইবলীস যে কত খুশি, মহাখুশি তা বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। আফসুস! মুসলমানরা তাদের উপর আরোপিত এই প্রতারনার ষড়যন্ত্রটি বুঝল না।

প্রতারিত এই লোকেরাও বিদআতকে মওত পর্যন্ত ধরে রেখে ভারী খুশি যে, আখিরাতের জন্য ঢের সওয়াব তার অর্জিত হয়েছে অথচ মৃত্যুর পর দেখবে হায় হায়! সবই বেকার, সবই পণ্ডশ্রম। বরং বেলা বয়ে গিয়েছে, সময় চলে গিয়েছে, সবকিছু খুইয়ে এখন সে সম্মুখীন হয়ে আছে এক ভয়াবহ ক্ষতিগ্রস্থতার। আপ্রাণ শ্রম দিয়ে মওত পর্যন্ত কাজ করল। কবরে গিয়ে মজুরী উত্তোলনের সময় দেখল হায়, সে তো এক প্রতারকের খপ্পরে পড়ে প্রতারিত। মজুরী নেই আরো জরিমানা দিতে হচ্ছে। আল্লাহ পাক অবশ্য আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন। প্রতারিত মানবতার এই ক্ষতিগ্রস্থতার উল্লেখ করে আলাহ জালা শানুহু ইরশাদ করেন,

قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا

বল, আমি কি তোমাদের সংবাদ দিব কর্মজীবনে সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্থদের সম্পর্কে? তারা হল সে সব লোক যাদের পার্থিব জীবনের সম্পাদিত চেষ্টা মেহনতগুলো পণ্ড হয়ে যায় অথচ তারা (মনে মনে) ধরে রাখছে যে, তারা খুব নেক আমল করে যাচেছ[২৪]।

যুগে যুগে বিদআতই শরীঅতকে প্রথম বিকৃত করেছিল

পৃথিবীতে বহু ধর্মমত চালু ছিল, আজো বহু চালু আছে। এদের সংখ্যা অগনিত। এ সব ধর্মের লোকেরা কেউ মূর্তি পুজা করে, কেউ সূর্য, চন্দ্র বা গ্রহ নক্ষত্রের পুজা করে এবং সেই আদলেই নিজেদের ঈমান, আকীদা ও আমল সম্পাদন করে থাকে। মোটকথা ইসলাম ছাড়া অন্য যত ধর্ম আছে সবগুলোর মধ্যে যে কাজটি অব্যতিক্রম পাওয়া যায় তা হল বান্দাহ হয়ে আল্লাহর সাথে শিরক করা। প্রশ্ন হল পৃথিবীর বিগত এ ধর্মগুলো কি আদতেই এই শিরকের প্রচার করেছিল? বিগত এসব ধর্মের প্রবর্তকগণ কি মানুষকে আলাহর ইবাদত বাদ দিয়ে গায়রুল্লাহ বা কোন রাসূলের ইবাদতের জন্য দাওয়াত দিতেন? এ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর হল, না, কখনোই নয়। সব ধর্মের পয়গাম্বর ও প্রবর্তকগণ হক ও ন্যায়ের উপর ছিলেন। উম্মতকে হক ও ন্যায়ের দাওয়াত দিয়ে গিয়েছেন। তাঁরা আজীবন ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা কাজে মেহনত করে গিয়েছেন। তাঁরা কখনো মানুষকে শিরকের দাওয়াত দেননি, দিতে পারেন না।

যুগে যুগে পৃথিবীতে অসংখা পয়গাম্বর তাশরীফ এনেছেন। প্রথমনবী হযরত আদম আ. আর শেষ নবী হররত মুহাম্মদ মুস্তফা সা.। এ দুই নবীর মাঝে রয়েছেন বহু নবী-রাসূল যারা সংখ্যায় অগনিত অসংখ্য। নবী-রাসূলের প্রত্যেকেই মুসলমানদের কাছে অতি শ্রদ্ধার পাত্র, ঈমানের অংশ। প্রত্যেকেই সুযোগ্য ন্যায়পরায়ন ও মাসূম ছিলেন বলে বিবেচিত। এই নবীগণ যুগে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠির কাছে প্রেরিত হন। মানুষকে দীনের দাওয়াত দেন। লোকেরা তাঁদের উপর ঈমান আনে। তাঁদের পথনির্দেশনা মোতাবেক জীবন পরিচালনা করে। এভাবেই উৎপত্তি হয় এক একটি ধর্মের। বর্তমান বিশ্বের ইয়াহূদী, খৃষ্ঠান, যথরুষ্ট, বৌদ্ধ ইত্যাদি যা আমরা দেখি সবাই বস্তুত এক সময় এক একজন নবীরই উম্মত ছিলেন।

২৪. সূরা কাহাফ, ১৮ ঃ ১০৩-১০৪।

বিভিন্ন ধর্মের প্রবর্তক এ নবীগণের কর্মধারা ছিল অভিন্ন। তাঁরা সকলেই মানুষকে তাওহীদ, রিসালত ও আখিরাতের শিক্ষা দেন। এমনকি তাঁরা প্রত্যেকেই মানুষকে শিরক বর্জনের জন্য কঠোরভাবে তালীম দিয়ে যান। হযরত নূহ আ. হযরত ইবরাহীম আ. প্রমূখ নবীগণ শিরকের বিরুদ্ধেই আজীবন সংগ্রাম করে গিয়েছেন। এতদসত্ত্বেও প্রশ্ন হল, প্রবর্তকগণের ওফাতের পর তাঁদের রেখে যাওয়া ধর্ম এবং তাঁদের উম্মতের মধ্যে গায়রুল্লাহর পুজা ও শিরক কিভাবে প্রবেশ করলো? আবার শুধু প্রবেশ করাই নয় যেই নবী-রাসূলগণ তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আজীবন শিরকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেলেন আজ তাঁদের সেই ধর্মের মধ্যে তাওহীদের কিছুই পাওয়া যাচেছ না কেন, অধিকন্তু তাদের সেই ধর্ম আপাদমস্তক কেন ভরে আছে শিরক ও শিরকী কাজ কর্মে এমনটি কিভাবে ঘটল?

গবেষক আলিমগণ বলেন, কোন নবীর ওফাতের পর উম্মত তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ থেকে বঞ্চিত হওয়া বরং সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে চলে যাওয়ার একমাত্র কারণ হল বিদআত। উম্মতরা চট করেই ঈমান থেকে শিরকে চলে আসে না। তাদের ত্রুটি যেটি হয়েছিল তা হল তারা নবীর শিক্ষাকে নিখুতভাবে ধরে রাখেনি বরং তাতে বিদআত এর অনুপ্রবেশকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। আর এই বিদআত ক্রমে ক্রমে তাদেরকে নিজ নবীর নির্মিত তাওহীদের গৃহ থেকে হটিয়ে বর্তমানের এই শিরকের গৃহে নিক্ষেপ করে দিয়েছে। বিদআত বাহ্যিকভাবে ধর্মের পোষাক পরিহিত ছিল তাই তারা টের করতে পারেনি।

নিরিহ মানুষকে তাওহীদের পবিত্র গৃহ থেকে সরিয়ে শিরকের নাপাক গৃহে ঢুকিয়ে দেওয়ার এই কাজে বিদআতের সবচেয়ে মোক্ষম অস্ত্র ছিল 'ইশকে রাসূল' এর শিরোনাম। উল্লেখ্য ইশকে রাসূল একটি অতি স্পর্শ কাতর জিনিস। এটি সঠিক পথে পরিচালিত হলে ঈমানের অঙ্গ হিসাবে অসামান্য উপকার সম্পাদন করে। আর সঠিক পথে পরিচালিত না হলে ঈমানের ভীষণ ক্ষতি সাধন করে। হাক্কানী সুফিয়ায়ে কিরাম স্পষ্ট বলেছেন, ইশকে রাসূল একটি অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র। এটি হকওয়ালার হাতে ব্যবহৃত হলে ঈমান পুষ্ঠ হয় ঈমান ও সুন্নতের আমলে জীবনের সবকিছু ফুলে ফলে ভরে উঠে। আবার এই অস্ত্র কোন বাতিলপন্থির হাতে ব্যবহৃত হলের ঈমান ধ্বংস হয় এবং বিদআত ও শিরকী কাজ জীবনের সবকিছু তছনছ করে দেয়। বিদআত যুগে যুগে ইশকে রাসূল শিরোনামের এই গোপন অস্ত্রটি ব্যবহার করে আসছে। নবী-রাসূলের ভালবাসা নিঃসন্দেহে অতি উত্তম জিনিস। কিন্তু এই ভালবাসার সঙ্গে শরীঅতের সীমানা সযত্নে রক্ষণাবেক্ষন করা জরুরী ছিল। পূর্বকালীন উম্মতরা নবীর প্রবর্তিত শতীঅতে বলে দেওয়া সেই সীমানার তোয়াক্কা করেনি। ফলে বিদআত নবী প্রেমের অস্ত্র ব্যবহার করে মানুষকে ক্রমে আল্লাহ জালা শানুহুর ইবাদত করা থেকে সরিয়ে খোদ নবী রাসূলের ইবাদত করার কাজে লাগিয়ে দেয়। মানুষ প্রাণভারে নবীর ইবাদত করতে থাকে। প্রাণভরে নবীর যিকর করতে থাকে। নবীর জন্য নিজের নিজেদের সবকিছু উৎসর্গিত করতে থাকে। অথচ সে জানে না যে, নবী নবীই। তিনি আলাহ নন, তিনি গায়রুল্লাহ। নবীর ইবাদত করা যায় না ইবাদত করতে হয় আল্লাহর। সে জানে না নবীর নামে উৎসর্গিত হয়ে গায়রুল্লাহর ইবাদত করে সে নিজের উপর কত বড় জুলম করে ফেলছে। আজো পৃথিবীতে মানুষ যে সব মূর্তি বা দেবতার পুজা করে এ মূর্তিগুলো কার তা খতিয়ে দেখলে দেখা যায় এ মূর্তিগুলো ছিল তৎকালীন প্রেরিত বিভিন্ন পয়গাম্বরগণের। আফসুস! যে পয়গাম্বরগণ আজীবন মূর্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেলেন ওফাতের পর তারাই নিজেদের উম্মতের কাছে মুর্তি হয়ে পুজিত হচেছন।

পৃথিবীতে মূর্তিপুজা প্রথম কিভাবে শুরু হল তার একটি বিবরণ দেন উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ গবেষক আলিম হযরত শাহ ওয়ালি উলাহ মুহাদ্দিস দেহলবী রহ.। মূর্তিপুজা সূচিত হওয়ার পেছনে তিনি বিদআতকে দায়ী করেন মৌলিকভাবে। তিনি বলেন, হযরত নূহ আ.-এর পূর্বে পৃথিবীতে পয়গাম্বর ছিলেন সায়্যিদুনা হযরত ইদরীস আ.। তিনি ছিলেন অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। পয়গাম্বর হিসাবে তাঁর কাছে যেমন ছিল পর্যাপ্ত আসমানী ইলম তেমনি জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানেও তিনি ছিলেন বিপুল সম্ভারে সমৃদ্ধ। আর এ কারণে তাঁর প্রতি মানুষের ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল অসাধারণ। জীবন সায়াহ্নে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন তখন ভক্ত উম্মতরা তার ভালবাসায় ভীষণ ভেঙ্গে পড়ে। এ সময় দুষ্ট ইবলীস হাজির হয় এবং তাঁর উম্মতের মানসিক দুর্বলতাকে অপব্যবহারের সুযোগ গ্রহণ করে। ইবলীস মানুষের আকৃতি ধারণ করে উম্মতের কাছে উপস্থিত হল এবং শোক সন্তপ্ত উম্মতের মধ্যে ঢুকে সে নিজকে তাদের মতই একজন অনুরাগী ভক্ত বলে জাহির

করল। শুধু কি অনুরাগী বরং তাদের চেয়ে অনেক অনেক বেশী অনুরাগী ভক্ত হিসাবে নিজকে প্রমাণ করল। এভাবে সে তাদের নেতৃত্বে চলে যায়। ইদরীস-ভক্ত মুসলমানরাও খুশি খুশিতে ভক্তের মুখোশধারী কপট ইবলীসের নেতৃত্ব আন্তরিকভাবে মেনে নেয়। এবার ইদরীস ভক্তির শিরোনামে শয়তান শুরু করে বিভিন্ন ধরনের বিদআতী কর্ম। সে ইদরীস ভক্তিকে বিশাল করে দেখায়। মানুষের মধ্যে ইদরীস ভক্তি বৃদ্ধির জন্য কথা ও কাজের ক্ষেত্রে নানা রকমের অতিশয়তা, জাল বক্তব্য, আকর্ষণীয় নতুন নতুন অনুষ্ঠানের জন্ম দিতে শুরু করে।

প্রথম দিকে ইদরীসী উম্মতের সচেতন লোকজন বিষয়টি নতুন আমদানীকৃত জেনেও ইবলীসকে ইদরীস-ভক্তির সুবাদে বারণ করেনি। ফলে সে সুযোগ পেয়ে যায়। কুচক্রী ইবলীস ক্রমে পয়গাম্বর হযরত ইদরীস আ. এর জীবনী আলোচনা, ইদরীস ভক্তি প্রকাশের আকর্ষণীয় নতুন নতুন পদ্ধতি উপস্থাপন ইত্যাদির পথ ধরে অবশেষে হযরত ইদরীসের মূর্তি তৈয়ার করে প্রথমতঃ শুধু ভক্তি প্রকাশ ও আশিকদের মনোসান্তনার জন্য আলোচনার মজলিসে মানুষের সামনে তুলে ধরে। তারপর ক্রমে এটিকে হযরত ইদরীসের শয়ন কক্ষে স্থাপন করে। লোকেরা এটিকে দেখতে আসে, দেখে আনন্দ বোধ করে এবং এটিকে ভক্তি করতে থাকে। এভাবে ভক্তি থেকে ক্রমান্বয়ে মূর্তিটির সম্মুখে নীরব দাঁড়িয়ে থাকা, দাঁড়িয়ে থাকা থেকে গলায় মাল্যদান, গলায় মাল্যদান থেকে কদমবুছি, কদমবুছি থেকে সম্মুখে হাতজোড় করে ঝুকে দাঁড়ানো, ঝুকে দাঁড়ানো থেকে কপাল ঠেকিয়ে সেজদা করা, সেজদা করা থেকে ধীরে ধীরে সকল ক্ষমতার কার্যত মালিক এই দেবতার ঘৃন্য আকীদা পোষণ করার দিকে নিয়ে যায়। মানুষের বিশ্বাসকে এই পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম হলে ভক্তের মুখোশধারী ইবলীসের মনষ্কামনা পরিপূর্ণ হল। পৃথিবীতে মূর্তি পুজার সুচনা হল। দুষ্ট ইবলীস ভারী খুশি হল। এভাবে মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত হল প্রচলিত মূর্তি পুজা। এ পুজাই পরবর্তীকালে পরবর্তী বংশধরের কাছে ধর্মীয় সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়। শুধু তাই নয় পুজারীদের মধ্যে আবার যারা সিনিয়র তাদের কেউ মারা গেলে তাকেও মূর্তি বানিয়ে একই ভাবে হযরত ইদরীস-এর মূর্তির পাশে স্থাপন করা হয়। তাছাড়া হযরত ইদরীস আ.-এর সময়ে আরো যারা নেক বান্দা ছিলেন এক সময় তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের লক্ষ্যে তাদের মূর্তিও তৈরী করে যথারীতি স্থাপন করা হয়। এভাবে এক একটি মন্ডপে বিভিন্ন মূর্তির সমাবেশ চলতে থাকে। সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. বলেন, পবিত্র কুরআনের সূরা নূহে বর্ণিত উদ, সুআ, ইয়াগুস, ইয়াউক, নাসর প্রভৃতি ছিল বস্তুতঃ সেই কালের বিভিন্ন নেক বান্দাদেরই নাম। পরবর্তী সময়ে লোকেরা তাদের মূর্তি বানিয়ে সেই নামে তাদের পুজা শুরু করে দেয়। এভাবে মূর্তি পুজার সূচনা হওয়ার পর ক্রমে এটি গোটা মানব সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। অতপর শিরকের এই প্রাদুর্ভাব থেকে মানুষকে উদ্ধারের জন্য প্রেরিত হন শরীঅতের প্রথম পয়গাম্বর সায়্যিদুনা হযরত নূহ আ.। মোটকথা এই বিদআতকে আপাত নজরে যত হালকা করেই দেখা হোক না কেন এ থেকেই শুরু হয়েছে যুগে যুগে শিরক, এই বিদআতই পরিনামে ঘটিয়েছে পবিত্র শরীঅতের মহাবিকৃতি।

বিদআতের পথ দিয়েই ইয়াহূদ নাসারা গুমরাহ হয়েছে

ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মগুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে ইয়াহূদ ও নাসারাদের ধর্ম হল অধিকতর দৃঢ়ভিত্তি সম্পন্ন। কেননা এ দু'টি ধর্ম দু'জন উচ্চপদস্থ এমন পয়গাম্বর কর্তৃক প্রবর্তিত ও প্রচারিত যাঁরা আল্লা জাল্লা শানুহু থেকে নবুওয়াতের সাথে আসমানী কিতাবও প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ইয়াহূদীরা হযরত মুসা আ.-এর উম্মত। আসমানী গ্রন্থ হিসাবে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে তাওরাত। আর নাসারা হল হযরত ঈসা আ. এর উম্মত। তাদেরকে দেওয়া হয় পবিত্র ইঞ্জীল। পৃথিবীতে ধর্মপ্রবর্তক সকল নবীকেই যে নতুন ধর্মগ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল তা নয়। মহানবী সা.-এর হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, পয়গাম্বরের সংখ্যা ছিল লক্ষ লক্ষ। অথচ কিতাবের সংখ্যা ছিল মাত্র একশত তিনটি। তম্মধ্যে বড় বড় কিতাব হল মাত্র চারখানা। তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও পবিত্র কুরআন। যুগে যুগে পয়গাম্বরগণ এসেছেন। যেহেতু তারা মানুষ ছিলেন তাই মানুষ হিসাবে যথাসময় তাঁরা ইন্তিকাল করে যান (হযরত ঈসা আ. ব্যতীত, তাঁকে কুদরতী ভাবে আসমানে তুলে নেওয়া হয়েছে, তিনি সেখানে জীবন্ত আছেন এবং কিয়ামতের আগে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. এর একজন উম্মত হিসাবে আবার ফিরে আসবেন)। কিন্তু তাদের পেশকৃত আসমানী কিতাব উম্মতের কাছে রয়ে যায়। এ সব কিতাবে তাঁদের প্রচারিত ধর্ম ও আদর্শের সবকিছু বিদামান। যে চারখানা বড় বড় কিতাব ছিল সেগুলোর

মধ্যে পয়গাম্বরের শিক্ষা, ধর্মপ্রচার, ঈমান আকীদার বিবরণ, আমলের রূপরেখা সবই রয়েছে। ইয়াহূদ ও নাসারা যেহেতু উচ্চপদস্থ দু'জন পয়গাম্বরকে পেয়েছে এবং সাথে সাথে দুখানা আসমানী কিতাবও প্রাপ্ত হয়েছে সেহেতু তাদের ধর্মীয় ভিত্তি কতটা দৃঢ় তা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রশ্ন হল যে, তাদের ভিত্তি এতটা দৃঢ় হওয়া সত্ত্বেও কেমন করে তারা ধর্মের মূল শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ে গিয়েছে, শুধু ঝরে পড়াই নয়; শিরক ও কুফরের গহীন আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে? কেমন করে তারা পয়গাম্বরের শিক্ষা দেওয়া আকীদায়ে তাওহীদ, আকীদায়ে রিসালত ও আকীদায়ে আখিরাত থেকে সরে গিয়ে খোদ পয়গাম্বরকেই আল্লাহর সন্তান (নাউযু বিলাহ্) জ্ঞান করতে শুরু করে দিয়েছে?

এ প্রশ্নের একটিই জবাব তা হল উম্মত কর্তৃক বিদআতকে আস্কারাদান। তারা যথাসময়ে বিদআতকে প্রতিরোধ করেনি। অধিকন্তু আবেগ তাড়িত হয়ে আরো উৎসাহিত করেছে। ফলে তারা নগদভাবে জাগতিক বিভিন্ন সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু নতুন নতুন সৃষ্ট বিদআত ও নতুন আবিস্কৃত ইবাদত পদ্ধতি তাদের ধর্মের পরিমণ্ডলে অনুপ্রবেশ করে যায়। ইবাদত বন্দেগীর ক্ষেত্রে নতুন নতুন পদ্ধতি, চিন্তা, ধ্যান-ধারনা তাদের ধর্মীয় সকল শাখা প্রশাখাগুলোকে দখল করে নেয়। পরিণামে তাদের ধর্ম থেকে পয়গাম্বরের রেখে যাওয়া সুন্নাতগুলো ক্রমে সব বিদায় নেয়। আর সেই স্থানগুলো দখল করে বসে পরবর্তীকালীন মানুষের খহিশাত, বাড়াবাড়ি, খেয়ালখুশি ও সীমালঙ্গন প্রবণতা থেকে সৃষ্ট নানা রং, নানা ঢং ও চিত্রের বিদআত কর্মসূমহ। এই ধারাবাহিকতায় বাহ্যিক নাম তো তাদের রয়েছে ইয়াহূদী কিংবা নাসারা কিন্তু তাদের ভিতরের কাজকর্মের সবই পরিনত হয়ে গিয়েছে নিজেদের বানানো ও নিজেদের মনগড়া কাজকর্মে।

ইয়াহূদ নাসারার উচিৎ ছিল তাদের সম্মানিত পয়গাম্বরগণের পবিত্র শিক্ষার উপর অটল অবিচল থাকা। পয়গাম্বর যে জিনিসের জন্য জীবন সাধনা করে গিয়েছেন অর্থাৎ আকীদায়ে তাওহীদ, আকিদায়ে রিসালত ও আকিদায়ে আখিরাত এ তিন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের যত্ন করা। তা থেকে কোন কিছু যেন ছুটতে না পারে তা চেষ্টা করা, আবার নতুন কিছু যেন তাতে ঢুকতে না পারে তা কঠিনভাবে প্রতিহত করা। (যেমন সার্বিক যত্ন ও প্রতিহত করেছিলেন সায়্যিদুনা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা.) তারা সেটা করেনি। ইয়াহূদ নাসারা এই তিন জিনিসের যথার্থ হিফাযত তো নয়ই; অধিকন্তু মনগড়াভাবে ধর্মের মধ্যে যুক্ত করেন নেয় বিভিন্ন নতুন জিনিস। যেমন সংসার-বিরাগী হওয়া ও সন্ন্যাসবাদ ইত্যাদি। এইগুলো সায়্যিদুনা হযরত মূছা আ. কিংবা সায়্যিদুনা হযরত ঈসা আ. এর সুন্নাহের মধ্যে কোন দিন ছিল না। পরে উম্মতদের পক্ষ থেকে এগুলো ধর্মের মধ্যে সংযুক্ত হয়েছে। পয়গাম্বরদের সত্যিকার আশিক উম্মতদের উচিৎ ছিল এগুলোর শক্ত প্রতিহত করা। কিন্তু তারা তা করেনি। ফলে এই বিদআত প্রথমত ইবাদতের নতুন পদ্ধতি রূপে চালু হয়, তারপর ক্রমে এটি অন্যায় পথে দুনিয়া কামাই করার কাজে সর্বসাধারনের মধ্যে (হাদিয়া ও খয়রাত শিরোনামে) প্রচলিত ও গৃহীত ব্যবস্থা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এক পর্যায়ে এটি মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাওহীদের প্রচারক খোদ পয়গাম্বরকেই মানুষের উপাস্য হিসাবে দাঁড় করিয়ে দেয়। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم

আর সংসার-বিরাগী হওয়ার প্রথা- এ বিদআত তারা নিজেরা প্রবর্তন করে আমি তাদের এই বিধান দেইনি[২৫]।

ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله

(তাদের) পণ্ডিৎ ও সংসার-বিরাগীদের অনেকেই লোকের ধন সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে থাকে এবং লোককে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে[২৬]।

---

২৫. সূরা হাদীস, ৫৭, ২৭।
২৬. সূরা তাওবা, ৯ ঃ ৩৪।

اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا

(ফলে) তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের পণ্ডিৎ ও সংসার-বিরাগীদেরকে নিজেদের প্রভুরূপে গ্রহণ করেছে এবং মারয়াম তনয় মাসীহকেও। অথচ তারা তো এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিল[২৭]।

কোন সন্দেহ নেই যে, ইয়াহূদ নাসারার ধর্মে এই বিদআত ও শিরকগুলো যুক্ত হয়েছিল ধর্মীয় বিষয়ে পয়গাম্বরের এঁকে দেওয়া সীমানার তোয়াক্কা না করে তাদের বিভিন্ন রকমের অতিশয়তা ও বাড়াবাড়ি অবলম্বন এবং নিজেদের খেয়াল খুশি মত নতুন নতুন বিধার অনুপ্রবেশ করানোর সূত্র থেকে। এ কারণেই মহানবী সা. নিজ উম্মতকে এ ব্যাপারে কঠিনভাবে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়ে বলেন,

اياكم والغلو فى الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو فى الدين

সাবধান! দীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাকো। কেননা দীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের ধ্বংস করেছিল। একখানা হাদীসে আছে,

عن انس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشدوا على انفسكم فيشدد الله عليكم فان قوما شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم فى الصوامع والديار ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم رواه ابو داود

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. (আমাদেরকে বলতেন, ইবাদত বন্দেগীর কাজে তোমরা নিজেদের উপর নিজ থেকে কোন কঠোরতা আরোপ করো না। তাহলে আলাহও তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করবেন। ইতপূর্বে এমন সম্প্রদায় গত হয়েছে যারা নিজেদের উপর কঠোরতা আরোপ করেছিল বিধায় আল্লাহ তাদের উপর কঠোরতা আরোপ করে দেন। আজকে খৃষ্টানদের গীর্জা ও গীর্জাকেন্দ্রীক বৈরাগ্যজীবন বস্তুত সেই হেয়ালীপনার পরিনামে আরোপিত কঠোরতারই ধ্বংসাবশেষ। এটি তাদের মনগড়া বিদআত যার বিষয় আল্লাহ তাদের কাছে বিধান নাযিল করেননি[২৮]।

স্বয়ং ইয়াহূদ নাসারাকেও লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

قل يا اهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل

হে কিতাবী লোকেরা ! তোমরা তোমাদের দীন সম্মন্ধে অনুমোদনহীনভাবে বাড়াবাড়ি করো না এবং যে সম্প্রদায় ইতপূর্বে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করেছে ও সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছে তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না[২৯]। শরীঅতের অবকাঠামোর মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চিহ্নিত করে দেওয়া বিভিন্ন সীমানা লংঘন করে যারা বিদআতের জন্ম দেয় পবিত্র কুরআনের ভাষায় তারা অভিশপ্ত, অভিশপ্ত, অভিশপ্ত। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذالك بما عصوا وكانوا يعتدون

বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল যে, তারা দাউদ ও মারয়াম তনয় ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছে। এটি তাদের এ জন্য ঘটেছিল যে, তারা ছিল অবাধ্য এবং (আলাহ ও তাঁর রাসূলের দেওয়া) সীমানার লংঘনকারী[৩০]।

বিদআতের এই অনুপ্রবেশই নাসারাদেরকে আল্লাহ জালা শানুহুকে বাদ দিয়ে আল্লাহর বান্দা হযরত ঈসা আ. ও তাঁর জননী হযরত মারয়াম আ.-এর ইবাদত করার কাজে লাগিয়ে দেয়। অথচ হযরত ঈসা আ.

২৭. সূরা তাওবা, ৯ ঃ ৩১।
২৮. সুনান আবু দাউদ।
২৯. সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৭৭।
৩০. সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ৭৮।

কখনো মানুষকে তাঁর কিংবা তাঁর জননীর পুজা করতে বলেননি। তিনি তো ছিলেন তাওহীদ-এর ধারক ও প্রবর্তক। শিরক বা কুফরীর দাওয়াত প্রদান তাঁর কাছ থেকে চিন্তাও করা যায় না। মহান আলাহ স্পষ্ট জানিয়ে দিচেছন,

واذ قال الله يا عيسى بن مريم أانت قلت للناس اتخذونى وامى الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لى ان اقول

ما ليس لى بحق ان كنت قلته فقد علمته ––– ما قلت لهم الا ما امرتنى به ان اعبدوا الله ربى وربكم الخ

স্মরণ কর; আল্লাহ যখন বলবেন, হে মরিয়মের পুত্র ঈসা ! তুমি কি মানুষকে এমন কথা বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার জননীকে ইলাহদ্বয় রূপে গ্রহণ কর। সে বলবে; হে আল্লাহ! তুমিই মহিমান্বিত। যে কথা বলার কোন অধিকার আমার নেই তা বলা আমার পক্ষে কিভাবে শোভন হতে পারে। যদি আমি এমনটি বলে থাকতাম তাহলে তুমি তা অবশ্যই জানতে। .. তুমি আমাকে যে আদেশ করেছো তা ব্যতীত তাদেরকে আমি কিছুই বলিনি[৩১]।

মোটকথ্য ইয়াহূদ নাসারা গুমরাহ হয়েছে এবং গুমরাহীর চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যেই মূলসূত্রটির কারণে সেটি হল এই ঘৃনিত বিদআত। এই দুষ্ট বিদআতই তাদেরকে ধর্মের সহীহ আকীদা ও সহীহ আমল থেকে সরিয়ে দেয়। তাদেরকে ধর্মের শিরোনামে ভয়ানক শিরক ও কুফরীর মধ্যে নিক্ষেপ করে দেয়। নাউযু বিলাহ।

রাসূলুল্লাহ সা. শরীঅতের নতুন সংযোজনের কোন কিছু বাকি রেখে যাননি

বিদআত মানে নতুন সংযোজন ও পরিমার্জন। পৃথিবীর সকল জিনিসের মধ্যে সংযোজন ও পরিমার্জন একটি ভাল জিনিস। বরং পছন্দনীয় উদ্যোগ। কিন্তু শরীঅত ও সুন্নাহ এই নীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শরীঅত ও সুন্নাহের ক্ষেত্রে কোন ধরনের সংজোযন ভাল জিনিস নয়। কেননা নতুন কোন কিছুর সংযোজন কখন হয়ে থাকে? স্পষ্ট কথা যে, যখন পূর্ববর্তী অবস্থাটি কোন কারণে ত্রুটিযুক্ত থাকে, কিংবা অসম্পূর্ণ থাকে, কিংবা পূর্ববর্তী অবস্থার মধ্যে কোন কিছু বাদ পড়ে থাকে, কিংবা তাতে নতুনভাবে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তখন প্রয়োজন দেখা দেয় নতুন সংযোজন, সম্পাদনা ও পরিমার্জনের। এই সংযোজন দ্বারা পূর্বের ত্রুটি দূর করা হয়, পূর্বের অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দান করা হয়, পূর্বের বাদ পড়াকে সংযুক্ত করা হয় এবং নতুন সৃষ্ট ত্রুটি সংশোধন করা হয়। হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা. মানুষের কাছে যে শরীঅত ও সুন্নাহ রেখে গিয়েছেন তাতে উপরোক্ত সমস্যাগুলোর কোনটিই চিন্তা করা যায় না। এখানে সংযোজন ও পরিমার্জনের সুযোগ নেই। এখানে কোনরূপ সংযোজনের কথা চিন্তা করার অর্থ দাঁড়ায় প্রকারান্তরে এ কথার দাবী করা যে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সা. এর কাজে কোন অপূর্ণতা আছে, বা কিছু বাদ পড়েছে বা কোন ত্রুটি হয়ে গিয়েছে (নাউযু বিলাহ) কিংবা এমনটা খেয়াল করা যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ সা. কাজটি দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করেননি। (নাউযু বিলাহ) বলুন, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর কাজ সম্পর্কে কি কোন উম্মত এমন চিন্তা করার অবকাশ আছে?

কোন কাজ সুচারু সম্পাদন কিংবা কোন জিনিস নিখুঁতভাবে রচনার জন্য আলাহ ও আলাহর রাসূল-এর চেয়ে অধিকতর দক্ষ ও উপযুক্ত আর কে হবে? কাজেই যেই শতীঅতের অবকাঠামো রচনার নির্দেশদাতা ও তদারককারী হলেন স্বয়ং আল্লাহ জাল্লা শানুহু এবং বাস্তবায়ন ও রূপায়নকারী হলেন শেষনবী সায়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সা. সেই শরীঅতে কোন অসম্পূর্ণতা, বাদ পড়া কিংবা ত্রুটি থাকবে আর শত শত বছর পরে কোন পীর সাহেব কিংবা কোন আলিম সাহেব তা সম্পূর্ণ করে দিবেন এমন কথা কেউ কি মানতে পারে।

শরীঅতের এই অবকাঠামো চট করেই বানানো হয়নি যে, বিনির্মানের সময় তাতে সবকিছুর অনুপুংখ বিচারের সুযোগ ছিল না। বরং এটি বিনির্মিত হয়েছে সূদীর্ঘ তেইশ বছরে। এই সূদীর্ঘ তেইশ

---

৩১. সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ১১৬ -১১৭।

বছরের নবুওয়াতী জীবন ও মেহনত দ্বারা মহানবী সা.-এই শতীঅতের সবকিছু যেখানে যা দরকার নিরূপন করে দিয়েছেন। ইবাদত কাকে বলে, বিভিন্ন নেক আমল ও সওয়াবের কাজ বলতে কি কি আছে বা হতে পারে, কিভাবে এগুলো সম্পাদন করতে হবে, কোনটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ (ফরয) কোনটি কমগুরুত্বপূর্ণ (নফল) সবই তিনি নির্দেশ করে গিয়েছেন। পাশাপাশি সাহাবায়ে কিরামকে দিয়ে এ সবের নগদ বাস্তবায়ন করে তেইশ বছরে সবগুলো জিনিস পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ করে গিয়েছেন। অধিকন্তু তাঁর এ কাজে যে কোন ত্রুটি নেই, কোন কিছু বাদ পড়ে যায়নি বরং সকল দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ, পরিপূর্ণ সে মর্মে স্বয়ং আল্লাহ জাল্লাহ শানূহু পবিত্র কালামে ঘোষণা করে দিয়ে চিরদিনের জন্যও সত্যায়নও করে দিয়েছেন। এরপরও কি কোন মুসলমানের সন্দেহ থাকতে পারে পূর্ণাঙ্গ হওয়ার মর্মে? ইরশাদ হচেছ;

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا

আজ আমি তোমাদের দীন পুর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম[৩২]।

মুহাম্মদ সা.-এর পেশকৃত এই রূপরেখাই আল্লাহর কাছে একমাত্র গৃহীত দীন। এর বাইরে অন্য কিছু তা যত সুন্দর যত আকর্ষণীয় যত পরিমার্জিতই হোক না কেন আল্লাহর কাছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। তা দ্বারা আখিরাতে নাজাত পাওয়া যাবে না। ইরশাদ হচেছ ;

ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين

কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত[৩৩]।

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় প্রমাণ করছে যে, হযরত মুহাম্মদ সা. কর্তৃক পেশকৃত ইসলাম সকল দিক থেকে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ। এখানে কোন ফাঁক অবশিষ্ট নেই। এই ইসলাম নিজের যা আছে তা নিয়ে বিশ্ব মানবতার জন্য অনাগত সকল কালের যাবতীয় ধর্মীয় প্রয়োজন পূরণে পূর্ণমাত্রায় সক্ষম। এতে বিশ্বাস ও আমলকারীদের জন্য প্রয়োজন হবে না দীন ছাড়া অন্য কোন দিকে তাকাবার। প্রয়োজন হবে না বাইর থেকে কোন কিছু ধার করে আনার, প্রয়োজন হবে না এর ভিতর থেকে কোন কিছু বাদ দেওয়ার। আলাহ জালা-শানুহুর ইবাদত, নেক আমল ও সওয়াবের কাজ হিসাবে যা কিছু হতে পারে বা আছে তার সবই এতে মহানবী সা. দেখিয়ে দিয়েছেন। মহানবী সা. এর পর ইবাদতের নামে, নেক আমালের নামে বা সওয়াবের কাজের নামে নতুন কোন পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রয়োজন এখানে নেই। এতদসত্বেও যদি কোন নেকআমল (যা আসলে বিদআত) আবিস্কার করা হয় ; যদি এমন কোন নেক আমল চালু করা হয় যা মহানবী সা. ও সাহাবায়ে কিরামের যামানায় চালু ছিল না- তা দেখতে যতই চাকচিক্যময় হোক না কেন- সেটি বিদআত, সেটি বাড়াবাড়ি ও সেটি পরিত্যজ্য। সেটি ইসলামের পরিপূর্ণতা বিষয়ে কুরআনী ঘোষণার সম্পূর্ণ পরিপন্থি, সেটি প্রকারান্তরে ক্ষুদ্রভাবে নবী হওয়ার দাবী। এ জন্যই হযরত ইমাম মালিক রাহ. বলে গিয়েছেন যে, সাহাবীগণের মুবারক যুগে যে কাজ দীনী কাজ বলে মনোনীত ছিল না সেটি আজো দীনী কাজ বলে মনোনীত হবে না, হতে পারে না[৩৪]।

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হুযায়ফা ইবনুস ইয়ামান রা. স্পষ্ট বলেন,

كل عبادة لم يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها فان الاول لم يدع للاخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم

রাসূলুল্লাহ সা.এর সাহাবীগণ যে কাজ ইবাদত হিসাবে পালন করেননি সেটিকে তোমরা ইবাদত হিসাবে গ্রহণ করতে পার না। কারণ (এই দায়িত্বশীল) পূর্ববর্তীগণ পরবর্তীদের জন্য নতুনভাবে কথা বলার

৩২. সূরা মায়িদা ৫ ঃ ৩।
৩৩. সূরা আল ইমরান, ৩ ঃ ৮৫।
৩৪. ইমাম শাতিবী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১৫।

(নতুন কিছু সৃষ্টি করার) কোন সুযোগ রেখে যাননি। অতএব, হে কারী সাহেবগণ! আল্লাহকে ভয় কর। (নতুনভাবে কোন প্রথা সৃষ্টি না করে) পূর্ববর্তীদের পথকে অনুসরণ করে চল[৩৫]।

সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ রা. বলেন, اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم।

তোমরা পূর্ববর্তীদের (সাহাবীদের) অনুসরণ করে চল নতুন বিদআত চালু করা থেকে বিরত থাকো। কেননা তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করে দেওয়া আছে[৩৬]।

সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ রা. অন্যত্র আরো কঠিন ভাষায় বলেন যে, দীনের মধ্যে কোন কিছু বৃদ্ধি করা বা তা থেকে কোন কিছু কমানোর অর্থ হল শরীঅত প্রদত্ত বিধানের উপর অনধিকার চর্চা করা, আল্লাহর দেওয়া শরীঅতের উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ করা, আল্লাহ কর্তৃক পূর্ণতা ঘোষণার বিরুদ্ধাচরণ করা ও আল্লাহকে অপমান করা। এটি এমন ধৃষ্ঠতা যা ক্ষমার অযোগ্য, যা থেকে কাউকে মাফ করা যায় না[৩৭]।

উল্লেখ্য এই উম্মত শরীঅতের অবকাঠামোকে ভেঙ্গে নতুন সংযোজনী সৃষ্টির দিকে যাবে কোন দুঃখে! তাদের পয়গাম্বর তো শরীঅত ও সুন্নাহকে এমন সুস্পষ্ট ও পরিচছন্ন (বাইযাউন নাকিয়্যাতুন) করে গিয়েছেন যে, এখানে রাতের অংশও দিবালোকের ন্যায় উজ্জল (লাইলুহা কা নাহারিহা)। শরীঅত ও সুন্নাহকে তিনি এতটা পরিপূর্রতা দান করে গিয়েছেন যে, আজ যদি পয়গাম্বর হযরত মুছা আ.-এর মত উচ্চপদস্থ কোন নবীও জীবিত থাকতেন তাহলে তার জন্যও সায়্যিদুনা মুহাম্মাদুর রাসুলুলাহ্ সা.-এর আনুগত্য ব্যতিরেকে কোন গত্যান্তর থাকতো না।

একখানা হাদীসে আছে ;

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم حين اتاه عمر فقال انا نسمع احاديث من يهود تعجبنا أفترى ان نكتب بعضها فقال أمتهوكون انتم كما تهوكت اليهود والنصارى لقد جئتكم بها نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعى رواه البيهقى

হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত যে, একবার হযরত উমর রা. মহানবী সা. এর দরবারে এসে বললেন যে, (ইয়া রাসূলুল্লাহ !) আমরা ইয়াহূদীদের কাছ থেকে অনেক (দুর্লভ ঘটনা ও উপদেশমূলক) কথা শুনি। এগুলো আমাদের কাছে ভাল লাগে। আপনি কি আমাদেরকে অনুমতি দেন যে, আমরা তা থেকে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করে রাখি। মহানবী সা. বললেন, তবে কি তোমরা অস্থির দিকভ্রান্ত হতে চাও যেভাবে ইয়াহূদ নাসারা অস্থির দিকভ্রান্ত হয়েছিল? আমি দীন ও শরীঅতের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা রেখে যাইনি যা স্পষ্ট করতে হবে। বরং প্রত্যেকটি কাজকে এমন স্পষ্ট করে দিয়েছি যে, আজ যদি স্বয়ং মূসা আরও জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁর পক্ষেও আমার কথা ও কাজের অনুসরণ ব্যতিরেকে কোন উপায় থাকতো না[□□]। এ হাদীসের অপর বর্ণনায় আছে;

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفس محمد بيده لو بدأ لكم موسى فاتبعتموه وتركتمونى لضللتم عن سواء السبيل ولو كان حيا وادرك نبوتى لاتبعنى رواه الدارمى

তখন রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করলেন, সেই মহান সত্তার শপথ যার হতে আমি মুহাম্মদ সা. এর প্রাণ। ধরে নেওয়া হোক যে, আজ হযরত মূসাও আ. কোন ভাবে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেলেন,

৩৫. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী, আল আমরু বিল ইত্তিবা, পৃ. ৯৭; হযরত আল্লামা মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন,

بيضائ اى واضحة حال من ضمير بها قوله نقية صفة بيضاء اى ظاهرة صافية خالية عن الشك والشبة وقيل المراد بها مصونة عن التبديل والتحريف والاصرار والاغلال خالية عن التكاليف الشاقة وقيل بيضاء نقية حالان مترادفان انظر مرقاة المفاتيح

৩৬. ইমাম দারেমী, আস সুনান, মুকাদ্দিমা, পৃ ২০৫।

৩৭. মাওলানা আবদুর রহীম, সুন্নাত ও বিদআত, পৃ. ২২।

৩৮. সুনান বায়হাকী, মুসনাদে ইমাম আহমদ, সূত্র ঃ মিশকাত, পৃ. ৩০।

আর তোমরা তাঁর অনুসরণ শুরু করলে এবং আমার শিক্ষাকে বাদ দিলে তাহলে নির্ঘাৎ তোমরা সরল পথ থেকে কিছুত হয়ে গেলে। যদি মূসা আ. জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুওয়াত কাল পেতেন তাহলে তিনি অবশ্যই আমার অনুসরণ করতেন[৩৯]।

বিবেচ্য বিষয় যে, শরীঅত ও সুন্নাহর বাইরে গিয়ে যদি জলীলুল কাদর পয়গাম্বর মুসা আ.-এর বক্তব্যও গ্রহণের অনুমতি না থাকে তাহলে উম্মতের অতি সাধারণ মানের দুনিয়াদার লোকদের অনুসরণে সুন্নাহ বিরোধী বিদআত বিষয়ক বক্তব্য কেমন করে গ্রহণযোগ্য হবে?

হাদীসে আরো আছে ;

عن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت بها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله ان هذه موعظة مودع فما تعهد الينا قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عليها بعدى الا هالك رواه ابو داود

হযরত ইরবায ইবন সারিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সা. আমাদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওয়ায করলেন। তাতে লোকজনের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকল এবং দিলগুলো বিগলিত হয়ে গিয়েছিল। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এ যেন কোন বিদায় গ্রহণকারীর দেওয়া নসীহত। তাহলে আমাদের প্রতি আপনি কি নির্দেশ দিচেছন? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমাদেরকে তো আমি এমন এক আলোকোজ্জল আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখে যাচ্ছি যেখানে রাতও দিনের মত আলোয়ে উদ্ভাসিত। আমার চলে যাওয়ার পর এমন আলোক উদ্ভাসিত পথ থেকে কোন হতভাগ্য ব্যতীত কেউ বিভ্রান্ত হবে না[৪০]।

এখানে হাদীসের বাক্যাংশ ‘আলোকোজ্জল আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখে যাচ্ছি’ কথাটি লক্ষ্যনীয়। বাক্যাংশ থেকে বুঝা যায় যে, মহানবী সা. নিজ জীবদ্দশায় শতীঅতের বিষয়াষয় কতটা স্পষ্ট ও পরিচছন্ন করে গিয়েছেন। এই বাক্যাংশ প্রমাণ করছে যে মহানবী সা. তাঁর জীবনে শতীঅত ও সুন্নাহকে এমনই স্পষ্ট ও উজ্জল করে গিয়েছেন যে, এটি মানুষের ঘোরতর সমস্যা সংকুল অন্ধকারেও দিনের আলোয়ের মতই পথের দিশা দিতে সক্ষম। এ দিশাপ্রাপ্তির জন্য নতুনভাবে কারো কাছে ধন্যা দেওয়া বা কোন কিছু ধার করে আনা বা নতুন সংযোজনের প্রয়োজন হবে না।

বিশিষ্ট তাবিঈ হযরত ইবরাহীম নাখয়ী রহ. বলেন, আল্লাহ জাল্লা জানুহু তোমাদের জন্য এমন কোন কল্যাণ অবশিষ্ট রাখেনি যা সাহাবায়ে কিরামের নিকট গোপন বা অজ্ঞাত ছিল। অথচ সাহাবীগণ ছিলেন তাঁর রাসূলেরই সঙ্গী এবং তাঁর মাখলূকাতের মধ্যে সর্বোত্তম জমাআত। কাজেই যেই কল্যাণ ও নেকআমল সাহাবীদের সময়ে ছিল না কিংবা যেটি তাদের জ্ঞাত ছিল না সেটি তোমাদের জন্য কল্যাণের বিষয়ই নয়[৪১]।

মহানবী সা. শতীঅত ও সুন্নাহর কোন কিছু বাকি রেখে যাননি। অধিকন্তু কোন ধরনের হ্রাস বৃদ্ধি করতে নিষেধ করেছেন। এতদসত্ত্বেও যারা নতুন কিছুর সংযোজন করতে চায় তারা বস্তুতঃ রাসূলের দেওয়া আদেশ নিষেধ ও বিধি-বিধানের বিরুদ্ধাচরণকারী। সাহাবী হযরত আনাস বলেন, যে কাজকে রাসূলুল্লাহ সা. নেককাজ বলে নির্দিষ্ট করে দেননি সেটিকে কেউ নিজ থেকে নেককাজ মনে করার চেয়ে বড় অন্যায় আর কিছু নেই। এমন লোকদেরকে মহান আল্লাহ মহাবিপর্যয় ও মর্মান্তদ শাস্তি পাওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে ধমকবাণী উচ্চারণ করেছেন। ইরশাদ হচেছ,

فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم

---

৩৯. ইমাম দারেমী মিশকাত, পৃ. ৩২।

৪০. ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী, সূত্র ঃ মিশকাত, প্রাগুক্ত।

৪১. সুন্নাত ও বিদআত, পৃ. ২৪।

সুতরাং যারা তাঁর (রাসূলের) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের সতর্ক হওয়া উচিৎ এই মর্মে যে, তাদের উপর অপতিত হবে কোন বড় বিপর্যয় কিংবা অপতিত হবে তাদের উপর মর্মান্তুদ শাস্তি[৪২]।

মুসলমান হিসাবে একজন মানুষের জীবনে সম্পাদন উপযোগী সওয়াবের যত কাজ হতে পারে তার সবই রাসূলুল্লাহ সা. উম্মতকে শিখিয়ে নিয়েছেন। কাজেই তাঁর ওফাতের পর তাঁর শিক্ষাদানকে অতিক্রম করে গিয়ে সওয়াবের নতুন কোন পদ্ধতির আবিস্কার বা আমদানী সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। উম্মতকে এভাবে সওয়াবের কাজ শিখানোর জন্য পয়গাম্বরই যথেষ্ট। সওয়াবের যাবতীয় কাজ শিখিয়ে দেওয়া শুধু রাসূলুল্লাহ সা.ই নয়, এটি সকল নবীরই সাধারণ দায়িত্ব। যে লোক নবী নয় সে এই কাজে হাত দেওয়া মানুষকে গুমরাহ করারই অপচেষ্টা।

একখানা হাদীসে আছে,

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه انه قال فاجتمعنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه لم يكن نبى الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم الخ كتاب الامارة

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুস আস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর আমরা রাসূলুলাহ সা. এর কাছে এসে একত্রিত হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, আমার পূর্বের প্রত্যেক নবীরই এই দায়িত্ব ছিল যে, তিনি তাঁর উম্মতের জন্য যত ভাল বিষয় জানেন সে বিষয়ে তাদেরকে দিকনির্দেশনা দিবেন। আবার তাদের জন্য যত খারাপ বিষয় জানেন সেগুলো থেকে তাদের সাবধান করবেন[৪৩]।

একখানা হাদীসে মহানবী সা. নিজ সম্পর্কে আরো স্পষ্ট বলেন,

ما بقى شيء يقرب الى الجنة ويباعد من النار الا وقد بين لكم

জান্নাতের নিকটে নিয়ে যাওয়া ও জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখার কোন বিষয়ই বাদ রাখা হয়নি, সবই তোমাদেরকে বর্ণনা করে দেওয়া হল[৪৪]।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের এ সকল উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য রাসূলুলাহ সা.-এর পরে নতুন কোন রীতি চালু করার অবকাশ শরীঅতে নেই। সওয়াব ও নেক আমল বিষয়ক সবই মুহাম্মদুর রাসূলুলাহ সা. বলে গিয়েছেন। তাতে নতুন সংযোজন করার মত কোন কিছু বাকি রেখে যাননি।

দীন হিফাযতের মৌলিক কাজ দু'টি সুন্নাহের প্রতিষ্ঠা ও বিদআতের প্রতিরোধ

আসমান থেকে অবতীর্ণ যে কোন শরীঅত ও ধর্মকে বিকৃতির হাত থেকে সংরক্ষিত রাখতে হলে জরুরী কাজ হল দু'টি। এক. সংশ্লিষ্ট পয়গাম্বরের সুন্নাহ অর্থাৎ আল্লাহর হুকমকে বাস্তবায়নের জন্য তিনি যেই তরীকা শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন সেই তরীকা যথাযথভাবে ধরে রাখা, যেন তা থেকে কোন কিছু বাদ পড়ে না যায়। দুই. তাঁর পেশকৃত সুন্নাহর বাইর থেকে কোন কিছু তাতে অন্তর্ভুক্ত না করা। বিগত প্রত্যেক নবীর উম্মতগণ যতদিন পর্যন্ত উপরোক্ত নীতিদ্বয়কে কঠোরভাবে মেনে চলেছে ততদিন পর্যন্ত গুমরাহী তাদের স্পর্শ করতে পারেনি। পক্ষান্তরে যখন থেকে তারা নিজ নবীর সুন্নাহ অনুসরণে গাফিলতি শুরু করল এবং কারো খাহেশ ও খেয়াল-খুশি মত নতুন নতুন নেক আমল বানিয়ে তা দীন মনে করে অনুসরণ আরম্ভ করল তখনই তারা হিদায়াত থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল। পবিত্র কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ ইরশাদ করেন,

فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا

---

৪২. সূরা নূর, ২৪ঃ৬৩।
৪৩. কিতাবুল ইমারাহ, হাদীস ৪৭৭৬।
৪৪. ইমাম তাবারানী, আল মুজামুল কাবীর, খ. ২, পৃ. ১৫৫, হাদীস নং-১৬৪৭।

তাদের পরে আসল একদল অপদার্থ অনুসারী যারা সালাত নষ্ট করল ও খেয়াল-খুশি পরবশ হল। সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে[৪৫]।

এ আয়াত নির্দেশ করছে যে, অনুসারীদের জন্য উচিত ছিল পয়গাম্বও সা. সালাতের যেই তালীম দিয়ে গিয়েছেন সেটি অবিকৃতভাবে ধরে রাখা। কিন্তু তারা পয়গাম্বরের আমানত রক্ষা করেনি। তাঁর তালীম অবিকৃতভাবে ধরে রাখেনি বরং তাতে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। তাদের উচিৎ ছিল খাহেশ ও খেয়াল-খুশি মত নতুন কিছু বানিয়ে তাতে সংযোজন করা থেকে বিরত থাকা কিন্তু তারা বিরত থাকেনি বরং খেয়াল-খুশিরই অনুসরণ করেছে। ফলতঃ তারা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর ভাষায় 'অপদার্থ অনুসারী' বরং 'কুকর্মের জন্য শাস্তির উপযুক্ত' বলে বিবেচিত হল। আয়াতখানা থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির নির্দেশও পাওয়া যাচ্ছে। তা হল আসমানী যেই কোন দীনই সংরক্ষিত রাখতে হলে তাতে দুটি কাজ সম্পাদন করা জরুরী। এক. পয়গাম্বরের সুন্নাহকে ধরে রাখা ও ধারাবাহিক আমলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখা। দুই. নতুন কোন তরীকা, প্রথা প্রচলন তথা বিদআতের আমদানী না করা বরং তা শক্ত হাতে প্রতিরোধ করা।

আয়াতখানা থেকে আরো বুঝা যায় যে, কোন ধর্মে সুন্নাহ ও সুন্নাহের আমলকে যতবেশী চর্চা করা হবে সেই ধর্মের বুনিয়াদ ততই দৃঢ়তা অর্জন করবে। পক্ষান্তরে বিদআতকে যত প্রশ্রয় দেওয়া হবে ধর্ম ততই দ্রুত বিদায় নিতে থাকবে। এ কারণেই মহানবী সা. ওফাতের পূর্বকালীন সময়ে উপরোক্ত দুটি জিনিসের দিকে উম্মতের সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উম্মতকে সুন্নতের উপর দৃঢ় ও মজবুত থাকতে এবং বিদআতকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে চলতে নির্দেশ দেন। সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. বলেন, বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী সা. ইরশাদ করেছেন,

يا ايها الناس انى قد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا كتاب الله وسنة نبيه

হে লোক সকল! আমি তোমাদের কাছে এমন দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যে, তোমরা এ জিনিসদ্বয়কে যদি দৃঢ়ভাবে ধরে রাখ তাহলে কোন গুমরাহী কখনো তোমাদের স্পর্শ করতে সক্ষম হবে না। জিনিসদ্বয় হল, আলাহ জালা শানুহুর কিতাব ও তাঁর নবীর পেশকৃত সুন্নাহ[৪৬]।

হাদীসে আরো আছে,

عن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال ---- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان كان عبدا حبشيا فانه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفى رواية وكل ضلالة فى النار رواه احمد وابو داود والنسائى كما فى مشكواة

হযরত ইরবায ইবন সারিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, -- অতঃপর রাসূলুলাহ সা. ইরশাদ করলেন, আমি তোমাদেরকে অসিয়্যত করছি, তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলবে, তোমাদের নেতৃবৃন্দের নির্দেশ শুনবে ও মেনে চলবে, এমনকি সেই নেতা হাবশী গোলাম হলেও। আর তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরেও জীবিত থাকবে তারা শীঘ্রই দেখবে উম্মতের মধ্যে নানা রকমের মতভিন্নতা ও এখতিলাফ। (বিভিন্ন রকমের বিদআত, শ্রেণীবিভক্তি, উম্মতকে খণ্ড বিখণ্ড করে দিবে) এ সময় তোমাদের করণীয় হবে যে, তোমরা আমার সুন্নাহ ও আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নাহকে শক্ত হাতে ধরবে এবং মাড়িদাঁতের সাহায্যে কামড় দিয়ে রাখবে। সাবধান ! নতুন নতুন বিদআতী কাজকর্ম থেকে দূরে থাকবে। কেননা প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবিত জিনিসই বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই হল গুমরাহী। অন্য বর্ণনায় আছে, আর প্রত্যেক গুমরাহীর পরিণতিই হল জাহান্নাম[৪৭]। হাদীসে আরো আছে;

৪৫. সূরা মারয়াম, ১৯ ঃ ৫৯।

৪৬. মুসতাদরাক, খ. ১, পৃ. ৯৩।

৪৭. ইমাম তিরমিযী, আস সুনান, খ. ২, পৃ. ৯২; ইমাম আবূ দাউদ, আস সুনান, খ. ২, পৃ. ২৭৯; ইমাম ইবন মাজা, আস সুনান, পৃ. ৫; ইমাম দারেমী, আল মুসনাদ, পৃ. ২৬; ইমাম আহমদ, আল মুসনাদ, খ. ৪, পৃ. ২৭; মিশকাত, পৃ. ২০/৩০।

عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله خير الهدى

هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم

হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. এক বক্তৃতায় বলেন, আম্মা বাদ, সর্বোত্তম কথা হল আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত কথা। সর্বোত্তম পথনির্দেশনা হল মুহাম্মদ সা. নির্দেশিত পথনির্দেশনা। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট জিনিস হল দীনের মধ্যে সৃষ্ট নতুন নতুন জিনিস তথা বিদআত। সকল বিদআতই হল গুমরাহী[৪৮]।

মুসলমানদের মধ্যে বিদআতের পথ দিয়েই বিকৃতি অনুপ্রবেশ করবে

কোন পথিক যখন তেপান্তরের মুখে একলা হয়ে যায় তখন তার বিপদের সীমা থাকে না। তার সম্মুখে থাকে দিগন্ত বিস্তৃত একাধিক পথ। কোনটির গন্তব্য কোথায় কে জানে? এই পথিক বড় অসহায়। প্রশ্ন হল, শেষ নবী হযরত রাসূলুল্লাহ সা. উম্মতকে কি জীবনের কোন বাঁকে এমন অসহায় বানিয়ে রেখে গিয়েছেন? এর স্পষ্ট উত্তর হল, না। রাসূলুল্লাহ সা. উম্মতকে এমন অবস্থায় রেখে যাননি। বরং কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত সর্বকালের মানুষ যেন নিজের সঠিক পথ চিহ্নিত করে নিতে পারে এবং প্রকৃত গন্তব্যে নিশ্চিতভাবে পৌঁছতে পারে সে লক্ষ্যে তিনি তাদের ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয় সকল দিক নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর ওফারে পর থেকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত উম্মতের ঈমান আমল ও আখলাকের কখন কি অবস্থা হবে, ক্রমে তাদের গতি কোন দিকে কিভাবে অগ্রসর হবে, তাদের সামনে কি কি সমস্যা দেখা দিবে, সমস্যাগুলোর উত্তরণ কিভাবে সম্ভব হবে ইত্যকার সব কিছুই তিনি বলে গিয়েছেন। তাঁর সেই দিকনির্দেশনাগুলো হাদীস গ্রন্থাবলীতে 'আলইতিসাম বিস সুন্নাহ, তাহযীর আনিল বিদআহ, আলমালাহিম, আলফিতান, আশরাতুস সাআ' প্রভৃতি শিরোনামে সংকলিত আছে। কাজেই করুনার আধার মহানবী সা.কে দোষ দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। তিনি সব বলে দিয়ে গিয়েছেন। তিনি নিজ জিম্মাদারী সুচারু সম্পাদন করে গিয়েছেন। তাঁর ওফাতের পর বর্তমানে উম্মতের লোকেরা তাঁর সেই নির্দেশকৃত পরামর্শগুলোর প্রতি গভীর মনোযোগ দেয় না সেটাই হল মূল সমস্যা। আর মনোযোগ দিচ্ছে না বলেই সমাজে আজ সৃষ্টি হচ্ছে যাবতীয় জটিলতা। আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদের হিফাযত করুন।

এখানে আরো একটি কথাও স্পষ্ট করা দরকার। তা হল মহানবী সা. 'আলিমুল গায়েব' (অদৃশ্য সম্পর্কে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জ্ঞাত) ছিলেন না। আলিমুল গায়েব একমাত্র আল্লাহ জাল্লা শানুহু। তিনি গায়েব জানেন। কোন ধরনের মাধ্যম ব্যতিরেকে তিনি সব জিনিসের বর্তমান অতীত ও ভবিষ্যত সম্পর্কে সম্যক অবগত। মহানবী সা. মহান আলাহর জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে ওয়াহীর মাধ্যমে ভবিষ্যতের এই সব কিছু জ্ঞাত হয়ে মানুষকে কিছু কিছু জানিয়ে গিয়েছেন। মহানবী ছিলেন শেষ নবী ও বিশ্বনবী। তাঁর নবুওয়াতকাল কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত। কাজেই তিনি নিজ নয়ুয়াতকালের আওতায় অবস্থিত কাছের ও দূরের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে উম্মতকে সত্যের সন্ধান প্রদান করে নিজের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করেছেন। উম্মতের যে যেই যুগের বা যেই ভাষা বা ভূখণ্ডের মানুষই হোক না কেন প্রত্যেকেই যেন সঠিক পথনির্দেশনা পায়, সেই লক্ষ্যে তিনি ভবিষ্যতের এই কথাগুলো বলে গিয়েছেন। বিশেষতঃ দীনের সঠিক রূপটি (সুন্নাহ) কোন্ কোন্ চোরাপথ দিয়ে বিকৃতির শিকার হতে পারে সেগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করে গিয়েছেন।

ভবিষ্যত বিষয়ক হাদীসগুলোর অধ্যয়ন থেকে জানা যায় যে, মুসলমানদের মধ্যে বিকৃতি অনুপ্রবেশ করবে এই বিদআতের পথ দিয়েই। বিদআত হল সুন্নাহর প্রতিপক্ষ, সুন্নাহভিত্তিক জীবনের শত্রু ও সংহারকারী। আরো অবাক হওয়ার বিষয় যে, এই রাক্ষুষে বিদআত মহানবী সা.-এর প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহকে যবাহ করে ইসলামের মধ্যে যে প্রবেশ করবে তা কোন কাফির-মুশরিককে মাধ্যম করে প্রবেশ করবে না; বরং মুসলমানদের মাধ্যমে প্রবেশ করবে। পাপাচারিতা বা নাফরমানীর শিরোনামে প্রবেশ করবে না, বরং ইবাদত বন্দেগীর শিরোনামে প্রবেশ করবে। দুনিয়া বা দুনিয়াদারীর রূপ নিয়ে প্রবেশ করবে না, বরং

৪৮. ইমাম মুসলিম, সূত্র ঃ মিশকাত, পৃ. ২৭।

আখিরাত ও আখিরাতের আমল পরিচয় দিয়ে প্রবেশ করবে। আলাহু আকবার কত কঠিন পরীক্ষা। যুগে যুগে বিদআতের এই ধার্মিক পোষাকই নিরিহ মানুষকে প্রতারিত করে আসছে নির্মমভাবে।

একজন ইবাদতকারী মুসলমান প্রথমতঃ কিভাবে সুন্নাহ থেকে বিদআতের দিকে পা বাড়াবে তার একটা বিবরণ নিম্নোক্ত হাদীসে পাওয়া যায়। হাদীসখানা সুবিস্তারিত। এখানে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করা হলঃ

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال --- ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عابد شرة ولكل شرة فترة فاما الى سنة واما الى بدعة فمن كانت فترته الى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته الى غير ذالك فقد هلك

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ... তারপর রাসূলুলাহ সা. ইরশাদ করেন, প্রত্যেক ইবাদতকারীর মধ্যেই আছে জোয়ার-ভাটা। আবার প্রত্যেক জোয়ারই একসময় হয়ে যায় প্রশান্ত। সেই প্রশান্তি হয়ত স্থিতি লাভ করে সুন্নাহ অবলম্বনে গিয়ে, নয়ত স্থিতি লাভ করে বিদআত অবলম্বনে গিয়ে। অতএব যার প্রশান্তি সুন্নাহ অবলম্বনের দিকে গিয়ে স্থিতি লাভ করবে সে হবে হিদায়াতপ্রাপ্ত। আর যার প্রশান্তি সুন্নাহ ছাড়া অন্য কিছু (বিদআত) অবলম্বনের দিকে গিয়ে স্থিতি লাভ করবে সে হবে ধ্বংসপ্রাপ্ত[৪৯]। এ হাদীস নির্দেশ করছে যে, ইবাদতকারীর কর্মে জোয়ার ভাটা থাকবেই এটি স্বাভাবিক জিনিস। তবে ইবাদতকারীকে খুব খেয়াল রাখতে হবে যে, সে কোন দিকে যাচেছ। সুন্নাহ অবলম্বনের দিকে যাচ্ছে, না নতুন কিছু উদ্ভাবনের দিকে যাচ্ছে। তার আমলের তরক্কী ও দিলের মুহাব্বত ক্রমে সুন্নাতের দিকে বাড়ছে না অন্য কোন দিকে। উল্লেখ্য তার গতি নবী আ. এর সুন্নাহকে অনুসরণের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে ভাল, সে শুকরিয়া আদায় করবে। আর তার গতি যদি সুন্নাহ ছাড়া অন্য কোন দিকে অগ্রসর হতে থাকে তাহলে তখনই থেমে যেতে হবে। তখন বুঝতে হবে যে পথ অবলম্বনে কোথাও ভুল হয়ে গিয়েছে কাজেই সেখান থেকেই ফিরে চলে আসতে হবে সুন্নাহের দিকে। উল্লেখ্য বিদআতের দিকে পা বাড়ানোর এই প্রথম বিন্দু সম্পর্কে অনেক ইবাদতকারী সচেতন নয়। আর সেই সচেতন না থাকার দরূন মনের অজান্তে ব্যক্তি গুমরাহীতে আক্রান্ত হয়ে যায়।

নবুওয়াত পূর্বকালে লোকেরা গুমরাহী ও অকল্যাণের পথে ছিল। মহানবী সা. তাদেরকে সুন্নাহের তালীম দেন ও কল্যাণের পথে প্রতি ফিরিয়ে আনেন। তখন লোকেরা অকল্যাণ থেকে কল্যাণে ফিরে আসার মূল বিষয়টি ছিল বিদআতের পরিত্যাগ ও সুন্নাহর অনুসরণ। মহানীব সা. এর ওফাতের পর লোকেরা যখন আবার ক্রমে অকল্যাণের দিকে ফিরে যাবে তখনও অকল্যাণ থেকে ফিরে আসার মূল বিষয়টিও হবে বিদআতের পরিত্যাগ ও সুন্নাহের অনুসরন। এ মর্মে একখানা হাদীস নিম্নরূপ;

عن حذيفة رضى الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اسأله عن الشر مخافة ان يدركنى قال قلت يا رسول الله انا كنا فى جاهلية وشر فجائنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قال قلت وهل بعد ذالك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتى ويهدون بغير هديتى تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذالك الخير من شر قال نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها كذا فى المشكواة

হযরত হুযায়ফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সা.কে জিজ্ঞাসা করত কল্যাণের বিষয়ে। আর আমি জিজ্ঞেস করতাম অকল্যাণের বিষয়ে। যেন ভবিষ্যত অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করতে না পারে। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আমরা ছিলাম জাহিলী ধ্যান-ধারনা ও অকল্যাণের উপর। অতঃপর আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমাদেরকে এই কল্যাণের পথে নিয়ে আসেন। আচছা

৪৯. ইমাম আহমদ, আল মুসনাদ, হাদীস ৬৪৪১, ৬৬৬৪; আলামা হায়সামী, মাওয়ারিদুয যামআন, খ. ২, পৃ. ৩৯৪; ইবন আবী আসিম, কিতাবুস সুন্নাহ, পৃ. ২৭, হাদীস ৫১।

এই কল্যাণের পর কি কোন অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, সেই অকল্যাণের পর কি পুনরায় কোন কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে সেখানে থাকবে কিছু অন্ধকার। আমি বললাম, সেই অন্ধকারটি কি? তিনি বললেন, (অন্ধকারটি হল বিদআত আবলম্বনের অন্ধকার। এভাবে যে,) লোকেরা আমার সুন্নাহর বাইরে অন্য কিছু অনুসরণ করে চলবে। লোকেরা আমার হিদায়াতের বাইরে অন্য কিছুকে হিদায়াত জ্ঞান করবে। অথচ সেগুলোর কিছু থাকবে ভাল কাজ আর কিছু থাকবে গর্হিত কাজ। আমি বললাম, সেই কল্যাণের পর কি কোন অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এমন কিছু প্রচারকের প্রকাশ ঘটবে যারা জাহান্নামের দুয়ারে দাঁড়িয়ে প্রচারণার কাজ করবে। যে তাদের আহবানে সাড়া দিবে তাকেই তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে[৫০]।

একখানা হাদীসে আছে,

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيلى امركم بعدى رجال يطفأون السنة ويحدثون بدعة ويؤخرون الصلواة عن مواقيتها قال ابن مسعود يا رسول الله كيف بى اذا ادركتهم قال ليس يا ابن ام عبد طاعة لمن عصى الله قالها ثلاث مرات   رواه احمد

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, শীঘ্রই তোমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করবে এমন কিছু মানুষ যারা সুন্নাহকে নিভিয়ে দিবে, বিদআতকে জারি করবে এবং সময় নষ্ট করে নামায পড়বে। হযরত ইবন মাসউদ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সা. আমি যদি তাদের যুগে পড়ে যাই তখন কি করবো? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করে সেই ব্যক্তির আনুগত্য করা যাবে না। কথাটি মহানবী তিনবার উচ্চারণ করলেন[৫১]।

এ হাদীস থেকেও বুঝা যায় যে, গুমরাহীর সূচনা সুন্নাতের পরিত্যাগ ও বিদআতের গ্রহণ এর মাধ্যমেই হবে। আরো বুঝা যায় যে, এটি সুচিত হতে খুব বিলম্ব হবে না, নবী আ.-এর ওফাতের পর খুব শীঘ্রই এসব শুরু হয়ে যাবে।

উম্মতের ভবিষ্যত অবস্থা সংক্রান্ত হাদীসগুলো থেকে বুঝা যায় যে, বিদআতের পথ দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে গুমরাহী অনুপ্রবেশের পর এটি ক্রমে ক্রমে মজবুত শিকড় গাড়বে, ডাল-পালা ছড়াবে, বছর বছর তাতে নতুন বিদআত সংযুক্ত হতে থাকবে। খাইরুল কুরুন তথা কল্যাণের তিন যুগের পর বিদআত স্রোতের ন্যায় অগ্রসর হতে থাকবে। অগ্রসর হয়ে গোটা মুসলিম সমাজকে গ্রাস করে নিবে। মুসলমানরা বিপথগামী ইয়াহূদ নাসারার অনুসরণে ওদের তুচছ কাজটিরও অনুসরণ করবে। আলিম-উলামা নামধারী লোকেরা ফিতনা ফাসাদের মধ্যে ঢুবে থাকবে। গুমরাহ লোকেরা প্রতিযোগিতা মূলকভাবে সমাজে ভয়ানক ভয়ানক বিদআতের আমদানী ঘটাবে। এক পর্যায়ে সুন্নাত থেকে মানুষ এতটা দূরে চলে যাবে যে, সুন্নাতের নাম নেওয়ার মতও কেউ থাকবে না। এভাবে ইসলামের সকল শিক্ষা দুনিয়া থেকে বিদায় নিলে মহান আলাহ্‌ আসমান যমীন রক্ষিত রাখার প্রয়োজন বোধ করবেন না। আসমান যমীন ভেঙ্গে দিবেন এবং তখন কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে।

বিদআত প্রতিরোধ ও সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার মেহনতেও থাকবে একদল ভাগ্যবান

বিদআত ইয়াহূদ নাসারার শরীঅতে অনুপ্রবেশ করে যেভাবে তাদের শরীঅতকে বিকৃত করেছে, সেভাবে মুসলমানদের শরীঅতে অনুপ্রবেশ করে এদের শরীঅতকেও বিকৃত করবে। এই দুই বিকৃতির মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, ইয়াহূদ নাসারার মধ্যে তখন এমন কোন জামাআত ছিল না যারা বিদআতের প্রতিরোধ বরং সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার জন্য মেহনত করে গিয়েছিল। আর ঐ দলটি না থাকার দরুন ইয়াহূদ নাসারা ক্রমে বিভ্রান্তি ও বিকৃতির অতল গহ্বরে গিয়ে পতিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থা হবে তা

---

৫০. মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ৪৬১।

৫১. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল মুসনাদ, হাদীস ৩৭৮০।

থেকে ভিন্ন। এখানে বিদআত অনুপ্রবেশ করলেও মহান আল্লাহ জালাহু শানুহু কিয়ামত পর্যন্ত এমন একটি জমাআতকে অবশিষ্ট রেখেছেন এবং রাখবেন যারা সকল কুরবানী ও ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে বিদআতের প্রতিরোধ ও সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার মেহনত চালিয়ে যাবেন। তাঁদের মেহনতের কারণে কিয়ামত পর্যন্ত আলাহ পাকের যে কোন বান্দা ইসলামের সঠিক ও বিশুদ্ধ পথ ও মতের দীক্ষা পেতে চায় সে সঠিক দীক্ষা পাবে। আর যে গুমরাহীকে পছন্দ করবে সে গুমরাহ হবে। হাদীসে আছে,

عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتى امر الله وهم كذالك رواه مسلم فى كتاب الجهاد

হযরত সাওবান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন আমার উম্মতের একটি দল সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে হকের উপর। শত্রুরা তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে সক্ষম হবে না। এ দলটি এভাবে হকের উপর থাকবে আল্লাহর নির্দেশ (কিয়ামতের প্রত্যক্ষ আদেশ) আসা পর্যন্ত[৫২]।

عن جابر بن سمرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة رواه مسلم

হযরত জাবির ইবন সামুরা রা. থেকে বর্ণিত যে, মহানবী সা. ইরশাদ করেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত এ দীন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে মুসলমানদের একটি দলের মাধ্যমে যারা দীনের জন্য যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে[৫৩]।

তায়িফা বা ইসাবা অর্থ হল দল। আরবী ভাষায় 'তায়িফাতুন' বা 'ইসাবাতুন' বলে ক্ষুদ্র কোন দলকে বুঝানো হয়। হাদীসে ব্যবহৃত তায়িফা বা ইসাবা শব্দ থেকে অনুমান হয় যে, বিদআতের প্রতিরোধ পূর্বক হক ও সুন্নাতকে যিন্দা রাখার পবিত্র মেহনতে কিয়ামত পর্যন্ত যে দলটি কাজ করবে তাঁরা সংখ্যায় খুব বেশী হবে না। অর্থাৎ সমাজের মূলস্রোত থাকবে বিদআতকারীদের পক্ষে। আর যারা হক ও সুন্নাতের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবেন তারা হবেন স্বল্প সংখ্যক মানুষের একটি দল। তবে এই দলটি সংখ্যায় স্বল্প হলেও এরাই হবে ভাগ্যবান। কেননা দুনিয়াতে হিদায়েত লাভ ও আখিরাতে কামিয়াবী অর্জনের সৌভাগ্য হবে তাদেরই জন্য। তা ছাড়া এই হাদীসেরই অন্য বর্ণনায় তাঁদেরকে 'মানসূরীন' অর্থাৎ আলাহর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত বলে বিশেষভাবে সম্মানিতও করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হল যে, তাঁরা হবেন এমন এক জামাআত যাদের কাজকে আল্লাহ পাক নিজের কাজ বলে অভিহিত করেছেন। কেননা দীনের হিফাযত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করছেন,

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون

নিশ্চয় আমিই এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি আর আমিই এর সংরক্ষণকারী[৫৪]।

এখানে লক্ষণীয় যে, মহান আল্লাহ কুরআন তথা দীনকে সংরক্ষণ করছেন মানে তিনি দুনিয়ায় অবতীর্ণ হয়ে কোন কাজ করেন বা করছেন তা নয়। এর অর্থ হল দুনিয়ায় তিনি যুগে যুগে এমন লোকদের সৃষ্টি করবেন যারা জাগতিক সকল ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে দীনের হিফাযত করে যাবে। উল্লেখ্য দীন হিফাযতের মূল কাজটি তো করছেন আল্লাহ। আর আল্লাহ যেই কাজকে নিজের কাজ বলে অভিহিত করছেন সেই কাজটি সম্পাদনের বাহ্যিক অনুষ্ঠানে তিনি যেই ক্ষুদ্র দলটিকে মনোনীত করলেন তাঁদের চেয়ে বড় ভাগ্যবান আর কে হতে পারে। একখানা হাদীসে মহানবী নিজেও এই জামাআতকে খোশ খবরী জানিয়েছেন। ইরশাদ হচেছ,

৫২. ইমাম মুসলিম, আস সহীহ, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস ৪৯৫০, পৃ. ৮৫৭।
৫৩. ইমাম মুসলিম, প্রাগুক্ত, হাদীস-৪৯৫।
৫৪. সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৯।

عن عمرو بن عوف رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء وهم الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدى من سنتى رواه الترمذى وفى رواية الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى كذا فى الاعتصام

হযরত আমর ইবন আউফ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ রা. ইরশাদ করেছেন, দীন ইসলামের সূচনা এমনভাবে হয়েছিল যেন অপরিচিত কোন পথিক (যার আপনজন বলতে সমাজে কেউ নেই)। আবার শীঘ্রই এই দীন ফিরে আসবে সূচনা পর্বের অবস্থার দিকে। (তার আপন জন বলতে তখন সমাজে কেউ থাকবে না) অতএব সে সব মানুষের জন্য (দুনিয়ার হিদায়াত ও আখিরাতের কামিয়াবী বিষয়ে) সুসংবাদ যারা দীনকে অবলম্বনের দরুন নিজেরা সমাজে অপরিচিত পথিকে পরিণত হয়েছে। তাদের পরিচয় হল যে, তারা আমার সে সব সুন্নাহকে প্রতিষ্ঠিত করবে সেগুলোকে লোকেরা বিকৃত করে দিয়েছিল[55]। অপর বর্ণনায় আছে, তাদের পরিচয় হল যে, তারা যে যুগে লোকেরা কিতাবুল্লাহর পরিত্যাগ চলবে সে যুগে কিতাবুল্লাহ কঠিনভাবে ধরে রাখবে এবং যখন সুন্নাহকে নিভিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলবে তখন সুন্নাহের উপর আমল কঠিনভাবে অব্যাহত রাখবে[৫৬]।

হকের উপর প্রতিষ্ঠিত এ ক্ষুদ্র দলটি প্রধানত আরো কি কি কাজ করবে মহানবী সা. তাও চিহ্নিত করে দেন। ইরশাদ হচেছ,

عن ابراحيم بن عبد الرحمن العذرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين كذا فى المشكواة المصابيح

হযরত ইবরাহীম ইবন আবদুর রহমান আল আযরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, এই ইলমে দীন বহন করার দায়িত্ব পালন করবে প্রত্যেক পরবর্তীদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণ লোকগণ। তাঁরা দীন থেকে বাড়াবাড়ী সৃষ্টিকারীদের আরোপিত বিকৃতি, বাতিল পন্থীদের বাক্যচুরি ও মূর্খদের ভূল ব্যাখ্যা (ইত্যাদি) দূরীভূত করবে[৫৭]।

দীনকে তার সঠিক অবয়বের উপর ধরে রাখার জন্য একটি ক্ষুদ্র দলতো থাকবেই। অধিকন্তু মহান আল্লাহ মাঝে মাঝে মুসলমানদের মধ্যে এমন সংস্কারক মনীষীও প্রেরণ করবেন যারা দীনকে সর্ব প্রকার বাতুলতা, বিভ্রান্তি ও বিদআত থেকে বিমুক্ত করে উপস্থাপন করবেন। হাদীসে আছে,

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يبعث لهذه الامة على رأس كل مأة سنة من يجدد لها دينها رواه ابو داود

হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ জাল্লা শানুহু এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতবর্ষের মাথায় এমন কোন সংস্কারক মনীষী প্রেরণ করেন যিনি মানুষের জন্য তাদের দীনকে (নিখুঁত সুন্নাতের আলোকে) নবায়ন করে দেন[৫৮]।

হকের প্রতিষ্ঠা ও বাতিলের প্রতিরোধ করার মেহনতে জড়িত এ ক্ষুদ্র দলটি মহান আল্লাহর কাছে মর্যাদা সম্পন্ন হলেও দুনিয়ায় তাঁরা বাস্তবে থাকবে অতিশয় নিরীহ ও বঞ্চিত। দুনিয়ার আরাম আয়েশ তাদের নসীবে জুটবে না। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে তাঁদের সঙ্গে থাকবে খুব অল্প সংখ্যক। সর্বসাধারণদের অধিকাংশ থাকবে বাতিল ও বিদআতের সমর্থনে। ফলে আলিম উলামা ও দীনদারদের যারা বাতিল পন্থীদের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলবে তারাই দুনিয়ায় অর্থ সম্পদ, মানসম্মান, হাদিয়া তোহফা ও

৫৫. ইমাম তিরমিযী, সূত্র ঃ মিশকাত, পৃ. ৩০।
৫৬. আলামা শাতিবী, প্রাগুক্ত।
৫৭. মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ৩৬।
৫৮. ইমাম আবূ দাউদ, সূত্র ঃ মিশকাত, পৃ. ৩৬।

ভক্তি শ্রদ্ধা বেশী প্রাপ্ত হবে। পক্ষান্তরে যারা বাতিলের সাথে সুর মিলাবে না বরং নিজদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে বিদআত খোরাফাত থেকে তাদেরকে বঞ্চিত হয়ে থাকতে হবে জাগতিক সকল প্রাপ্তি থেকে। শুধু তাই নয়, অধিকন্তু মাঝে মাঝে তাঁদেরকে চড়া দামের মাশুলও দিতে হবে এবং শিকার হতে হবে বাতিল পন্থীদের নির্মম আক্রমনের। মহানবী সা.-এর ভাষায় তখন কেউ হকের উপর টিকে থাকার অর্থ দাঁড়াবে যেন হাতের তালুর উপর জ্বলন্ত কয়লা ধরে রাখা[৫৯]। মোট কথা, এসব কুরবানীর বিনিময়ে কিয়ামত পর্যন্ত একটি ক্ষুদ্র দলের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক রূপ বিদ্যমান থাকবে। যেন কেউ হকের উপর চলতে চাইলে চলতে পারে। তবে হকের এই পথ বড় কঠিন এবং ত্যাগ ও বঞ্চনা সাপেক্ষ পথ বলে এই পথের সমর্থক কিংবা কর্মীর সংখ্যা দিনে দিনে হ্রাস পাবে। এ ভাবে একদিন এমন আসবে যে, হকের কোন সমর্থক বা কর্মীই বিদ্যমান থাকবে না তখন নিশ্চিত কিয়ামত হয়ে যাবে।

মুসলিম সমাজে বছর বছর যুক্ত হবে নতুন বিদআত

উত্থান ও পতন জগতের স্বাভাবিক নিয়ম। সকাল বেলা পূর্ব দিকে সূর্য উদিত হয়। অর্ধ দিবস পর্যন্ত সূর্য উপরের দিকে উঠতে থাকে। ঠিক দুপুরে তার উত্থান পূর্ণতায় পৌঁছে যায়। পুর্ণতার চূড়ান্ত বিন্দুতে পৌঁছার পর থেকেই শুরু হয় পতন। এই অধঃপতন ক্রমে সন্ধায় দিবসের অবসান ঘটিয়ে দেয়। এটাই সৃষ্টির অমোঘ বিধান।

বিশ্বমানবতার মধ্যে বিশুদ্ধ ঈমান ও আমলের অনুশীলন ও চর্চা শুরু হয় প্রথম মানুষ সায়্যিদুনা হযরত আদম আ. থেকে। তারপর এ চর্চা ক্রমে অগণিত পয়গাম্বরের যুগ পার হয়ে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ সা.-এর যুগে এসে পূর্ণতায় পৌঁছে। তিনি ছিলেন শেষনবী ও বিশ্বনবী। তাঁর সময়ে ঈমান ও আমলের দীক্ষা পুর্ণতার চূড়ান্ত বিন্দুতে আরোহন করে। উত্থানের চুড়ান্ত সীমানার পরই শুরু হয় পতন। তাই মহানবী সা.-এর ওফাত থেকেই আবার শুরু হল ঈমান আমলের ক্রম পতনশীলতা। সায়্যিদুনা হযরত উমর রা. স্পষ্ট বলেন, মহানবী সা.-এর লাশ মোবারকও যতক্ষণ পর্যন্ত ভূমির উপরে বিদ্যমান ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অন্তরে ঈমানের যযবা উচ্ছমান সম্পন্ন ছিল। তারপর যখন মহানবীর দেহ মুবারককে কবরস্থ করা হল তখন দেখা গেল অন্তরের সেই উচ্চমান জযবা নেই যা একমুহূর্ত পূর্বে অনুভূত হয়েছিল। তখন দেখলাম কি একটা ভীষণ ভীতি ও দুর্বলতা যেন অন্তরে ক্রমশঃ ছায়াপাত করে যাচ্ছে।

পতনশীলতা ও বিকৃতির প্রথম উম্মেষ ঘটে মানুষের মননজগতে। সেখান থেকে ধীরে ধীরে তার বাস্তব জীবনকে গ্রাস করে নেয়। সুন্নাতের আমল দ্বারা মানুষের দিল যেমন ক্রমে সাদা দবদবে ও নূরানী হয়ে যায় তেমনি বিকৃতি ও বিদআতের চর্চায় সেই দিল কালো কুচকুচে রংয়ে ধারন করে। মহানবী সা.-এর ওফাতের পর মুসলমানদের মননজগতে পতনশীলতা অনুপ্রবেশ পূর্বক কিভাবে দুটি হৃদয়কে সম্পূর্ণ সাদা দবদবে পরিচছন্ন কিংবা সম্পূর্ণ কালো কুছকুছে আবর্জনাপুর্ণ বানিয়ে দেয় তার একটা বিবরণ নিম্নোক্ত হাদীসে পাওয়া যায়। ইরশাদ হচেছ,

عن حذيفة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فاى قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء واى قلب انكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين ابيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والارض والآخر اسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه رواه مسلم كذا فى مشكواة

হযরত হুযায়ফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করছেন, মানব হৃদয়ের উপর অপতিত হবে নানা ধরনের পতনশীলতা ও বিপর্যয়। চাটাইয়ের টোয়াঁগুলো সেভাবে একটির পর একটি স্থাপিত হয় বিপর্যয়গুলোও এভাবে একটির পর স্থাপিত হতে থাকবে। অতএব যে হৃদয় এই

৫৯. ইমাম তিরমিযী, সূত্র ঃ মিশকাত, পৃ. ৪৫৯।

বিপর্যয়কে আত্মস্থ করবে সেখানে অংকিত হবে একটি কালো দাগ। আর যে হৃদয় তা অস্বীকার করবে তাতে অংকিত হবে একটি সাদা দাগ। অবশেষে হৃদয়দ্বয় এমন পর্যায়ে পৌঁছবে যে, তম্মধ্যে একটি হবে সম্পূর্ণ শুভ্র যেন কঠিন শুভ্র স্বেতপাথর, যাকে কিয়ামত পর্যন্ত কোন বিপর্যয় ক্ষতিগ্রস্থ করতে সক্ষম হবে না। আর অপরটি হবে কয়লার মত জমকালো যেন কোন পিয়ালা যা উপুড় করে রাখা আছে। মানুষের যখন এই অবস্থা হয়ে যাবে তখন সে নিজের খাহিশের বিপরীত কোন ভাল জিনিসকে ভাল বলে জ্ঞান করতে পারবে না। তদ্রুপ কোন মন্দ জিনিসকে মন্দ জ্ঞান করতে পারবে না[৬০]। (অর্থাত ব্যক্তি তখন ভাল মন্দের তারতম্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে।)

মনন জগতের বিকৃতির পর বাস্তব জীবনেও শুর হবে বিকৃতি। এ বিকৃতি কখনো থামবে না। বরং ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। তারপর দিন যত যেতে থাকবে বিকৃতি ও বিদআতের পরিমানও তত বাড়বে। তখন দেখা যাবে প্রতি বছরই মুসলমানের জীবন ও আমলের মধ্যে নতুন নতুন বিদআতের সংযোজন ঘটবে। হাদীসে আছে,

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال لا يأتى عليكم عام الا وهو شر من الذى كان قبله اما انى لست اعنى عاما اخضب من عام ولا اميرا خيرا من امير ولكن علمائكم وخياركم وفقهائكم يذهبون ثم لا يجدون منهم خلفا وتجئ قوم يقيسون الامر برائهم رواه الدارمى

হযরত আবদুলাহ্‌ ইবন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (হে লোক সকল) তোমাদের উপর এমন কোন নতুন বছর আসবে না যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় অধিকতর মন্দ নয়। আমার উদ্দেশ্য এ কথা বলা নয় যে, এক বছর অন্য বছরের তুলনায় অধিকতর সচছলতা সম্পন্ন কিংবা এক নেতা অপর নেতার তুলনায় ভাল। বরং আমার উদ্দেশ্য হল এ কথা বলা যে, তোমাদের মধ্যকার আলিমগণ, উত্তম লোকজন ও ফকীহগণ ক্রমে বিদায় নিয়ে যাবেন। তারপর তাঁদের যোগ্য উত্তরসূরী তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে না। তাদের স্থলে প্রতিস্থাপিত হবে এমন লোকজন যারা ধর্মীয় বিষয়কে নিজেদের মনগড়া সিদ্ধান্তের আলোকে (গলত) ব্যাখ্যা করবে[৬১]।

একখানা হাদীসে আরো স্পষ্ট বলা হয়েছে যেমন;

عن ابن عباس رضى الله عنه قال لا يأتى على الناس من عام الا احدثوا فيه بدعة واماتوا سنة حتى تحيى البدع وتموت السنن كذا فى الاعتصام

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মানুষের সামনে যেই নতুন বছর আসছে তাতেই তারা কোন না কোন বিদআত সৃষ্টি করছে এবং কোন না কোন সুন্নাহকে মিটিয়ে দিচেছ। এভাবে অবশেষে বিদআতসমূহ যিন্দা হবে আর সুন্নাহসমূহ মিটে যাবে[৬২]।

তিন যুগ পর ছড়িয়ে পড়বে মিথ্যর বেসাতি

বিদআতের উৎস হল মূর্খতা (জাহালত) ও খাহিশে নফস। বিদআত জন্ম নেয় মূর্খতা থেকে এবং লালিত হয় খাহিশে নফসের হাতে। এই বিদআত দূর করার উপায়ও দুটি। সহীহ্‌ ইলমের প্রচার ও তাকওয়ার প্রতিষ্ঠা। মহানবী সা. সাহাবীগণের মাঝে সহীহ ইলমের প্রচার ও তাকওয়া প্রতিষ্ঠার মেহনত করেন। ফলে সেই সমাজ থেকে সর্ব প্রকার বিদআত ও বিদআত থেকে সৃষ্ট শিরক, কুফর ও নাফরমানী যা যা ছিল সব বিদূরিত হয়েছিল। মহানবী সা.-এর ওফাতের পর ক্রমে সহীহ্‌ ইলমের হ্রাস ঘটতে থাকবে। বিধায় সমাজে জন্ম নিবে নানা মূর্খতা ও বিদআত। হাদীসে মহানবী সা. স্পষ্ট বলেন, মুসলিম সমাজে ক্রমে

৬০. ইমাম মুসলিম, সুত্র ঃ মিশকাত, পৃ. ৪৩১।
৬১. ইমাম দারেমী, আস সুনান, খ. ১, পৃ. ৭৫।
৬২. আল্লামা শাতিবী, আল ইতিসাম, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৪৪।

সহীহ ইলমের ধারক আলিমগণ বিদায় নিবেন। তাতে ইলমও বিদায় হয়ে যাবে। তখন সমাজে ছড়িয়ে পড়বে অজ্ঞতা, আর ঝেঁকে বসবে তাতে অন্ধকার। ইরশাদ হচেছ,

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس روسا جهالا فسألوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا رواه البخارى ومسلم كذا فى مشكواة

হযরত আবদুলাহ ইবন আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, মহান আল্লাহ সহীহ ইলমকে হঠাৎ করে মানুষের মন থেকে তুলে নিবেন না। বরং ক্রমে ক্রমে আলিমগণকে তুলে নেওয়ার মাধ্যমে ইলমকে তুলে নিবেন। এভাবে অবশেষে যখন কোন হক্কানী আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা মূর্খ লোকদেরকে ইমামরূপে গ্রহণ করবে। লোকেরা তাদের কাছে শরীঅতের সিদ্ধান্ত জানতে আবেদন করবে। আর তারাও নিজেদের অজ্ঞতা সত্ত্বেও ফতওয়া দিয়ে যাবে। ফলে যেমন নিজেরা গুমরাহ হবে তেমনি অন্যদেরকেও গুমরাহ বানাবে[৬৩]।

কোন সমাজে এহেন মূর্খতা ছড়িয়ে পড়া অত্যন্ত ভয়ানক বিষয়। একখানা হাদীসে বলা হয়েছে এভাবে মূর্খতা ছড়িয়ে পড়তে থাকলে মুসলমানরাও আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে হেয় বিবেচিত হবে। তখন আল্লাহ তাদেরকে নানা ধরণের আযাবে আযাবগ্রস্থ করতে কোন পরোয়া করবেন না। ইরশাদ হচেছ,

عن مرداس الاسلمى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول وتبقى حفالة كحفالة الشعير والتمر لا يبالهم الله بالة رواه البخارى كذا فى المشكواة

হযরত মিরদাস আল আসলামী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, মুসলিম সমাজের নেক বান্দাগণ একের পর এক যে যত ভাল সে তত আগে বিদায় নিবেন। আর অবশিষ্ট থাকবে কিছু চিটা যব বা চিটা খেজুরের মত পড়ে থাকা লোকেরা। আল্লাহ এ লোকদের কোনই পরোয়া করবেন না[৬৪]।

এভাবে সাহাবা যুগ, তারিয়ী যুগ ও তাবি তাবিয়ী যুগ পর্যন্ত মুসলিম সমাজ খুব ভাল ও কল্যাণের সাথে থাকবে। মুসলিম সমাজে সৎ মানুষ পর্যাপ্ত পরিমান বিদ্যমান থাকবেন। কিন্তু কল্যাণের উপরোক্ত তিন যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর ক্রমশ দেখা দিবে মিথ্যার স্রোত। সেই স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সত্যের ইতোপূর্বে স্থাপনকৃত সকল আয়োজন। ইরশাদ হচেছ,

عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتى قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ان بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يؤفون ويظهر فيهم السمن وفى رواية ثم يظهر الكذب حتى ان الرجل ليحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد وفى رواية ثم يخلف قوم يحبون السمانة كذا فى المشكواة

হযরত ইমরান ইবন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট যুগ হল আমার যুগ, (সাহাবা যুগ) তারপরে উত্তম হল তারা যারা তাদের সঙ্গে সংযুক্ত (তাবিয়ী যুগ), তারপরে উত্তম হল তারা যারা তাদের সাথে সংযুক্ত (তাবি তাবিয়ী যুগ)। তারপর তাঁদের পরে আসবে এমন শ্রেণী যাদের কাছে সাক্ষ্য চাওয়ার পূর্বেই তারা সাক্ষ্যদানের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। যারা খিয়ানত করবে, আমানতদারী আদৌ রক্ষা করবে না। যারা মান্নত করবে কিন্তু পুরণ করবে না। যাদের মধ্যে প্রবণতা থাকবে শারীরিক ভাবে মোটা হওয়ার। অপর বর্ণনায় আছে, তাঁদের পরে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে

৬৩. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম, সূত্র ঃ মিশকাত, পৃ. ৩৩।
৬৪. সহীহ বুখারী, মিশকাত, পৃ. ৪৫৮।

পড়বে মিথ্যা। এমনকি মানুষ কসম করবে অথচ তার কাছে কসম চাওয়া হয়নি, সাক্ষ্য দিবে অথচ তার কাছে সাক্ষ্য চাওয়া হয়নি। অর্থাৎ গায়ে পড়েই মিথ্যা বলবে। অপর বর্ণনায় আছে, তারপর তাঁদের উত্তরাধিকারীরূপে আসবে এমন লোকেরা যাদের দৃষ্টি থাকবে যে, কিভাবে মোটা হওয়া যায় (শরীর মোটা করা যায়, গর্দান মোটা করা যায়)। অর্থাৎ তারা সত্য-মিথ্যার পরোয়া না করে কেবল নিজের উদর পূর্তির কথাই ভাববে[৬৫]।

উপরোক্ত হাদীসে তিনটি 'করন' তথা যুগ-এর কথা বলা হয়েছে। একটি যুগ কত বছরের হবে এ নিয়ে হাদীসে কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। তবে ভাষ্যগ্রন্থে বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কারো মতে এক এক করন হবে ৪০ বছর, কারো মতে ৮০ বছর, আবার কারো মতে ১০০ বছর। তবে অধিকতর বিশুদ্ধ মত হল যে, এটি নির্ধারিত কোন সংখ্যার সাথে সীমাবদ্ধ নয়। অতএব প্রথম যুগ হল সর্বশেষ সাহাবীর ওফাতকাল পর্যন্ত। এখানে সময় হল ১২০ বছর। দ্বিতীয় যুগ সর্বশেষ তাবিয়ীর ওফাতকাল পযন্ত। এখানে সময় হল ১২০ হিজরী সাল থেকে ১৭০ পযন্ত ৫০ বছর। তারপর তৃতীয় যুগ সর্বশেষ তাবি তাবিয়ীর ওফাতকাল পর্যন্ত। এটি ১৭০ হিজরী সাল থেকে ২০০ সাল পর্যন্ত ৩০ বছর ধরা হয়। এ হিসাব মতে হিজরী ২০০ সালের পরবর্তী অংশ হল ক্রমশ মিথ্যা ছড়িয়ে পড়ার যুগ। ইতিহাস প্রমাণ করে যে, মহানবী সা. এ ভবিষ্যৎবাণীর পূর্ণ সত্যতা পাওয়া গিয়েছে। এই উম্মতের মধ্যে ২০০ হিজরীর পরই সূচিত হতে থাকে নানা রকমের বিদআত ও শরীঅত বিরোধী নানা অনাচার। মাথা চাড়া দিয়ে উঠে সুন্নাহ বিরোধী নানা ধরনের দল, উপদল ও ফিরকা যা আজো বন্ধ হয়নি।

মুসলমানরা ইয়াহূদ নাসারার তুচছ কাজোটিরও পুনরাবৃত্তি ঘটাবে

আমরা জানি, মূলনীতি অভিন্ন হলে ফলাফলও অভিন্ন হয়। রোগ অভিন্ন হলে রোগ থেকে সৃষ্ট উপসর্গও অভিন্ন দেখা দেয়। কোন শরীঅত বিকৃত ও বিভ্রান্ত হওয়ার প্রথম ও প্রধান রোগ হল বিদআতের অনুপ্রবেশ। এ রোগ ইয়াহূদ নাসারার সমাজকে বিভ্রান্ত করেছে। তাদের আকীদা ও বিশ্বাস, আমল ও আখলাক, ধ্যানধারনা, রুচি, আচার আচরণ সবকিছু ক্রমে পরিবর্তত করে অবশেষে গুমরাহী ও শিরক দ্বারা কঠিন ভাবে আক্রান্ত বানিয়ে দিয়েছে। কাজেই এই রোগই যখন আবার মুসলিম উম্মাহর মধ্যে প্রবেশ করবে তখন যেই সব উপসর্গ যা ইতোপূর্বে ইয়াহূদ নাসারার মধ্যে দেখা দিয়েছিল সেগুলো ক্রমে ক্রমে এই উম্মতের মধেও দেখা দিবে। মুসলিম সমাজে বিদআতের এ রোগ অনুপ্রবেশের পর তাদের অবস্থা কি হবে তার একটা বিবরণ প্রিয়নবী সা. হাদীসে বলে গিয়েছেন। ইরশাদ হচেছ;

عن ابى واقد الليثى رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذى نفسى بيده لتركبن سنن من كان قبلكم كذا فى المشكواة

হযরত আবূ ওয়াকিদ আল লাইসী রা. থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, সেই স্বত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই অতিক্রম করবে তোমাদের পূর্ববর্তী ইয়াহূদ নাসারাদের চলা পথ দিয়ে[৬৬]।

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে লোকেরা যখন ইয়াহূদ নাসারার মত বিদআত অবলম্বন করবে তখন তাদের জন্য ইয়াহূদ নাসারার চলা সেই বিভ্রান্তি পথে হাঁটা ব্যতিরেকে গত্যন্ত র থাকবে না। একখানা হাদীসে আরো বলা হয়েছে,

---

৬৫. মিশকাত, পৃ. ৫৫৪।
৬৬. ইমাম তিরমিযী, সূত্র ঃ মিশকাত, পৃ. ৪৩৫।

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا حجر ضب تتبعتموهم قيل يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن رواه البخارى ومسلم كذا فى المشكواة المصابيح

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, কোন সন্দেহ নেই যে, তোমরা তোমাদের পুর্ববর্তীদের ভ্রান্ত অভ্যাস ও নিয়মনীতির অনুসরণ কর্মে পতিত হবে। এমন হুবহু অনুসরণ যে, সেখানে এক হাত ঘটে থাকলে এখানেও এক হাত, সেখানে এক বিঘৎ ঘটে থাকলে এখানেও এক বিঘৎ। এমনকি তারা যদি (আলোর পথ ছেড়ে দিয়ে) কোন গুই সাপের গর্তে গিয়ে স্থান নিয়েছিল বলে পাওয়া যায় তাহলে সেটিও তোমরা অনুসরণ করবে। প্রশ্ন করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সা. পূর্ববর্তীরা বলে কি আপনি ইয়াহূদ নাসারার কথা বলছেন? মহানবী সা. উত্তর দিলেন, এরা ছাড়া আর কারা হবে?[৬৭]

এই বিদআত মুসলিম সমাজে যখন প্রবশে করবে তখন এটি ইয়াহূদ নাসারার সাধারণ বিবেক ও সাধারণ রুচিবোধকে যেভাবে বিকৃত ও কুৎসীৎ করে দিয়েছিল তদ্রুপ মুসলিম সমাজের বিবেক ও রুচিবোধকেও সম্পূর্ণ কুৎসীৎ বানিয়ে ছাড়বে। ইরশাদ হচেছ,

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على امتى كما اتى على بنى اسرائيل حذو النعل بالنعل حتى ان كان منهم من اتى امه علانية لكان فى امتى من يصنع ذالك رواه الترمذى كذا فى المشكواة

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুলাহ সা. ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে গুমরাহীর এমন যামানা আপতিত হবে যেমন এসেছিল বনী ইসরাঈলের উপর। সম্পূর্ণ এক রকমের যেন একজোড়া জুতার একটির সাথে অপরটির মিল বিদ্যমান। এমনকি যদি তাদের মধ্যে এমন (কুৎসীৎ ঘটনা) ঘটে থাকে যে, কেউ তার নিজ মায়ের সাথে যিনায় লিপ্ত হযেছে জনসমক্ষে তাহলে আমার উম্মতের মধ্যেও সেই লোকটি পাওয়া যাবে যে এ জঘন্য কুকর্মে লিপ্ত হবে[৬৮]।

আফসুস বিদআত প্রচারের নেতৃত্ব দিবে আলিমদেরই এক শ্রেণী

যেই সরিষা দিয়ে ভুত তাড়ানো হয় সেই সরিষার মধ্যেই যদি ভূত ঢুকে পড়ে তাহলে ভূত তাড়ানোর আর কোন পথ অবশিষ্ট থাকে না। আলিমগণ মানুষকে হিদায়াতের তালীম দিবেন, মানুষকে গুমরাহী থেকে বাঁচাবেন, মানুষকে সঠিক পথের দিশা দান করবেন- এটাই নিয়ম। মুসলিম সমাজ আলিমগণের কাছ থেকে তাই আশা করে। কিন্তু এ আলিমরা যখন সঠিক কাজ বাদ দিয়ে বিদআত এর উপর চলা ও বিদআত প্রচারের কাজে নেমে যাবেন তখন উম্মতের জন্য বাঁচার আর কি উপায় থাকবে? সাধারণ মুসলমান কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিবে। সহীহ কথাটি তারা কার কাছ থেকে পাবে? উহ! কি কঠিন সমস্যা। হাদীসে আছে, শেষ যামানায় মুসলমানদেরকে সেই কঠিন অবস্থারও সম্মুখীন হতে হবে। উল্লেখ্য যে, যারা প্রকৃত আলিম তারা এ খিয়ানত কখনো করবেন না। আর যারা খিয়ানত করবে তারা বস্তুত আলিম নয়; তারা হল আলিমের পোষাক অবলম্বনকারী ঠকবাজ। তারা হল বাতিলপন্থী ও বিদআতপন্থী কুচক্রী দল। এ দলটি শরীরে

৬৭. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম, সূত্র ঃ মিশকাত, পৃ. ৪৫৮।

৬৮. ইমাম তিরমিযী, সূত্র ঃ মিশকাত, পৃ. মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন;

قوله كما اتى فاعل ليأتين مقدر والكاف فى كما منصوب على المصدر اى ليأتين على امتى زمان اتيانا مثل الاتيان على بنى اسرائيل او المراد ليأتين على امتى مخالفة لما انا عليه مثل المخالفة التى اتت على بنى اسرائيل حتى اهلكتهم وجاز ان يكون الكاف فاعلا اى ليأتين على امتى مثل ما اتى على بنى اسرائيل كذا فى المرقاة

আলিমের পোষাক ধারন করে কিংবা আলিমের সাটিফিকেট গ্রহণ করে এসব কুকর্ম সম্পাদন করবে। নতুবা হক্কানী আলিম যিনি দায়িত্বশীল ওয়ারিসে নবী সা. যার মনে আখিরাতে আল্লাহর সমীপে জবাবদেহীতার ভয় বিদ্যমান তাঁর সম্পর্কে এমন কাজের চিন্তাও করা যাবে না।

ইত্তিবায়ে সুন্নাত ও তাকওয়ার পথ চিরকালেই সুকঠিন মুজাহাদার পথ। এই পথে আখিরাতের কামিয়াবী আছে। কিন্তু জাগতিক কোন প্রাপ্তি নেই। এই পথে দৃঢ় মজবুত অবস্থায় থেকে ধন দৌলত কামাই করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে বিদআত ও খাহিশাতের পথ চিরকালই উর্বর পথ, হাদিয়া তোহফা ধন দৌলত কামাই রোজগারের পথ। তবে এই পথে আখিরাতের কামিয়াবী নেই। জাগতিক প্রাপ্তি এখানে অজস্র। খুব সস্তায় এখানে কামাই রোজগার করা যায়। উপরোক্ত দুটি পথ আলিমদেরকেও দুই দলে বিভক্ত করে দিয়েছে। হাদীসের ভাষায় প্রথমোক্ত নীতির অবলম্বনকারী আলিমদের বলা হয়েছে 'উলামায়ে আখিরাত' বা প্রকৃত আলিম আর শেষোক্ত নীতির অবলম্বনকারীদের বলা হয়েছে 'উলামায়ে সূ' বা দুনিয়াদার আলিম।

হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, দুনিয়াদার আলিমরা দুনিয়া কামাইয়ের জন্য সমাজে নতুন নতুন বহু বিদআত সৃষ্টি করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তারা বিদআতকে সৃষ্টি করবে, প্রশ্রয় দিবে ও লালন করবে। শরীঅত ও সুন্নাহর জলাঞ্জলি দিয়েও তারা নিজেদের জাগতিক প্রাপ্তি ও জাগতিক কামাই রোজগার ধরে রাখবে। তারা নিজেদের আকীদা ও আমল পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর নিক্তিতে বারবার পরীক্ষা করে বিশুদ্ধ বানানোর প্রতি আদৌ মনোযোগী হবে না। পক্ষান্তরে তাদের বেশী মনোযোগ থাকবে নিজেদের পোশাক আশাক, নিজেদের চেহারা ও অবয়ব, নিজেদের অভিনয় ও কণ্ঠস্বর প্রভৃতি কেমন করে মানুষের কাছে কত বেশী আকর্ষণীয় করে পেশ করা যায় সেদিকে। তাদের অন্তরের গহীনে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর সন্তুষ্টি কামনা বিরাজ করবে না বরং বিরাজ করবে গায়রুল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা। মহানবী সা. স্পষ্ট বলেন, ইসলামের মধ্যে জাহিলী ও বিদআতী কাজের সমর্থক এমন আলিম হল আলাহ জালা শানুহুর কাছে গোটা জগতের সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত ব্যক্তি। ইরশাদ হচেছ,

عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الناس الى الله ثلثة ملحد فى الحرم ومتبع فى الاسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرء مسلم بغير حق ليهريق دمه رواه البخارى كذا فى المشكواة

হযরত ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত। এক. হরমের অভ্যন্তরে অবস্থিত নাস্তিক, দুই. ইসলামের মধ্যে জাহেলী ও বিদআতী রুসম রেওয়াজের সমর্থক, তিন. রক্তপাত ঘটানোর ইচছায় কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে খুনের অভিযোগ আরোপকারী[৬৯]।

বিষধর সর্প ক্ষতিকর। তার চেয়েও বেশী ক্ষতিকর হলো উলামায়ে সূ। একখানা হাদীসে এই উলামায়ে সূ-কে উম্মতের জন্য সর্বাপেক্ষা ভীতিকর জিনিস বলে অভিহিত করা হয়েছে। অপর একখানা হাদীসে এদেরকে আকাশের নীচে অবস্থিত সর্বাপেক্ষা দুষ্ট লোক বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইরশাদ হচেছ,

عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يأتى على الناس زمان لايبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهى خراب عن الهدى علمائهم شر من تحت اديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود رواه البيهقى كذا فى المشكواة

হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, শীঘ্রই মানুষের উপর এমন এক যামানা আসবে যখন মানুষের মুসলমানী বলতে অবশিষ্ট থাকবে শুধু তাদের নামগুলো, কুরআন বলতে অবশিষ্ট থাকবে শুধু কিছু লেখা মাত্র। যাদের মসজিদগুলো হবে বড় বড় ইমারত কিন্তু এগুলো বঞ্চিত থাকবে হিদায়েতের কাজকর্ম থেকে। যাদের আলিমরা হবে আসমানের নীচে অবস্থিত সর্বাপেক্ষা দুষ্ট লোক,

৬৯. ইমাম বুখারী, আস সহীহ, সুত্র ঃ মিশকাত, পৃ. ২৭।

সমাজের নানা রকমের বিদআত ও বিপর্যয় তাদেরই ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে। আবার তাদের মধ্যে গিয়েই অবর্তিত হবে[৭০]।

عن الاحوص بن حكيم عن ابيه قال سأل رجل النبى صلى الله عليه وسلم عن الشر فقال لا تسألونى عن الشر وسلونى
عن الخير يقولها ثلاثا ثم قال الا ان الشر شرار العلماء وان الخير خيار العلماء رواه الدارمى

হযরত আহওয়াস ইবন হাকীম রা. নিজ পিতা সূত্রে বলেন, জনৈক ব্যক্তি মহানবী সা.-এর দরবারে এসে মন্দ ব্যক্তি কারা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিল। উত্তরে মহানবী সা. বললেন, আমাকে তোমরা মন্দ লোকদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করো না। বরং ভাল লোকদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা কর। কথাটি মহানবী সা. তিনবার বললেন। তারপর বললেন, মনে রখে দুষ্টেদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দুষ্ট হল দুষ্ট আলিম। আবার ভালদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভাল হল ভাল আলিম[৭১]।

একখানা হাদীসে নতুন নতুন বিদআতের আমদানীকারী দুনিয়াদার আলিমকে মহানবী সা. দাজ্জাল বলে আখ্যা দিয়েছেন। এভাবে দাজ্জাল বলে অভিহিত করা দ্বারা বুঝা যায় যে, মহানবী সা. তাদের প্রতি কত অসন্তুষ্ট। ইরশাদ হচেছ,

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فى آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم
من الاحاديث بما لم تسمعوا انتم ولا آبائكم فاياكم واياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم رواه مسلم كذا فى المشكواة

হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, শেষ যুগে তোমাদের মধ্যে আসবে বেশ কিছু মিথ্যুক দাজ্জাল আলিম। এরা তোমাদের সামনে এমন এমন কথা বা কাজ (কিংবা কথা বা কাজ) বিষয়ক হাদীস পেশ করবে যা তোমরা নিজেরা কোন দিন শোননি, এমনকি তোমাদের পূর্বপুরুষরাও কোন দিন শোনেনি। কাজেই সাবধান! তোমরা তাদের থেকে বেঁচে থাকো। যেন ওরা তোমাদের বিভ্রান্ত করতে না পারে কিংবা তোমাদের ফাসাদে পতিত করতে না পারে[৭২]।

আভিধানিকভাবে 'দাজ্জাল' শব্দটি 'দাজলুন' থেকে গৃহীত। দাজলুন অর্থ হল কোন মন্দ জিনিসকে ভাল জিনিসের আবরণ লাগিয়ে তা প্রতারণামূলকভাবে পেশ করা। দুনিয়াদার আলিম যেহেতু বিদআতের মত একটি গর্হিত জিনিসকে শরীঅতের পবিত্র পোশাকে সজ্জিত করে পেশ করে থাকে সেহেতু হাদীসে মহানবী সা. তাদেরকে দাজ্জাল বলে অভিহিত করেছেন। এই দাজ্জালদের ভেষভুষা ও কাজকর্ম সম্পর্কেও মহানবী বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে;

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فى آخر الزمان دجالون يختلون الدنيا
يلبسون للناس جلود الضأن من اللين السنتهم احلى من السكر وقلوبهم قلوب الذياب يقول الله تعالى أبى يغترون ام
على يجترئون فبى حلفت لأبعثن على اولئك منهم فتنة تدع الحليم فيه حيران رواه الترمذى كذا فى المشكواة

হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, শেষ যামানায় এমন কিছু লোক (দুনিয়াদার আলিম) বের হবে যারা কৃত্রিম দীনদারী অবলম্বনপূর্বক দুনিয়াদার লোকদের প্রতারিত করবে (অর্থাৎ দুনিয়াদারদের কাছ থেকে হাদিয়া কামাই করে নিবে)। তারা মানুষকে শুধু দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং নিজেদেরকে বিনয়ী প্রমাণের উদ্দেশ্যে দুম্বার চামড়া পরিধান করবে। (অর্থাৎ লেবাস পোশাকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে)। তাদের মুখের ভাষা হবে চিনির চেয়েও মিষ্টি (সুকরুন কণ্ঠস্বর) কিন্তু হৃদয় হবে নেকড়ে বাঘের হৃদয়। (অর্থাৎ তাদের হৃদয়ে থাকবে দুনিয়া কামইয়ের মোহ, সম্মান প্রতিপত্তির মোহ,

৭০. ইমাম বায়হাকী, সূত্র ঃ মিশকাত, পৃ. ৩৮।
৭১. সুনানে দারেমী, সূত্র ঃ মিশকাত, পৃ. ৩৭।
৭২. ইমাম মুসলিম, সূত্র ঃ মিশকাত, পৃ. ২৮) মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন;
قال القارى بما لم تسمعوا انتم ولا آبائكم اى يتحدثون بالاحاديث الكاذبة ويبتدعون احكاما باطلة واعتقادات فاسدة كذا فى المرقاة

দীনদারদের প্রতি শত্রুতা পোষণ, নাফসানী খাহেশ পুরনেচছা। এসব দিক থেকে তাদের হৃদয় হবে নেকড়ের হৃদয়ের মত নিষ্ঠুর) এদের ব্যাপারে আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলেন, তবে কি এ লোকেরা তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছি বলে ধোকাগ্রস্থ হচেছ, না কি তারা আমার বিরুদ্ধাচরণের দুঃসাহস প্রদশন করছে? আমি নিজ স্বত্তার কসম করে বলছি, অবশ্যই আমি তাদের উপর আরোপ করবো তাদেরই কারো কারোর মাধ্যমে এমন মহাবিপর্যয় যা তাদের মধ্যকার সর্বাপেক্ষা শান্ত লোকটিরও নাভিশ্বাস তুলে ছাড়বে[৭৩]।

عن ابن عمر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى قال خلقت خلقا السنتهم احلى من السكر وقلوبهم أمر من الصبر فبى حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم فيهم حيران فبى يغترون أم على يجترئون

رواه الترمذى كذا فى المشكواة

হযরত আবদুলাহ ইবন উমর রা. থেকে বর্ণিত যে, মহানবী সা. ইরশাদ করেছেন, (হাদীসে কুদসী হিসাবে) আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলেন, আমি কিছু লোককে এমন সৃষ্টি করেছি যাদের ভাষা চিনি থেকেও বেশী মিষ্ট। কিন্তু তাদের দিল তুইতা থেকেও বেশী তিতা। আমার স্বত্তার কসম। আমি তাদের জন্য এমন বিপর্যয় নির্ধারণ করবো যা তাদের সর্বাপেক্ষা শান্ত সুবোধকেও উদ্রান্ত করে তুলবে। তবে কি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছি বলে তারা ধোকাগ্রস্থ হয়েছে, না কি তারা আমার বিরুদ্ধাচারণের দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করছে[৭৪]।

সমাজের রন্ধে রন্ধে ঢুকে পড়বে বিদআত

দীন ও শরীঅত হল সুন্নাতের রাজ্য। এখানে মহানবী সা. এর সুন্নাতই হল মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু কিয়ামতের আগে মুসলমানদের অবস্থা হবে এমন যে, দীন ও শতীঅতের প্রতিটি অঙ্গ থেকে সুন্নাত সরে গিয়ে স্থান দখল করবে বিদআত। লোকেরা কতিপয় বিদআতের চর্চা করাকেই দীনদারী ও বুযর্গী জ্ঞান করবে। মুসলমানদের ব্যক্তি জীবন ও সামাজিক জীবনের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকবে বিদআত আর বিদআত।

বিদআতের মধ্যে বাহ্য একটা আকর্ষণ আছে। এ আকর্ষণ মানুষের স্বভাবজাত কুওয়াতে হায়ওয়ানিয়ার (কুপ্রবৃত্তি) সাথে সংশ্লিষ্ট বলে মানুষ তাতে সহজে প্রভাবিত হয়। বিশেষতঃ সাধারণ মুসলমানদের যারা বিদআতের প্রকৃতি ও হাকীকত সম্পর্কে কিছুই জানে না তারা অতি সহজেই কাবু হয়ে পড়ে। এ লোকদেরকে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত সুন্নাতের তালীম গ্রহণ ও সুন্নাতের অনুশীলন করার পরও যদি হঠাৎ কখনো কোন বিদআতের আহবান কানে পড়ে দেখা যায় যে, তৎক্ষণাৎ তারা এত দিনের আমলকৃত সুন্নাতের আমল থেকে ধপাস ছিটকে গিয়ে বিদআতে পতিত হয়ে যায়। আফসূস, বিদআতের বাহ্য আকর্ষণ যুগে যুগে মানুষেকে এভাবে বিপদে ফেলেছে।

যে কোন মানুষের ভিতর স্বভাবজাত দুটি শক্তি আছে। একটিকে বলা হয় ‘কুওয়াতে হায়ওয়ানী’ আর অপরটিকে বলা হয় ‘কুওয়াতে মালাকী’। উভয় শক্তিই মানব মনে অবস্থানপূর্বক বাইরের কোন সৌন্দর্য বা আকর্ষণকে স্বাগত জানায়। তম্মধ্যে কুওয়াতে হায়ওয়ানী স্বাগত জানায় মন্দ জিনিসের সৌন্দর্যকে আর কুওয়াতে মালাকী স্বাগত জানায় ভাল জিনিসের সৌন্দর্যকে। বিদআত মন্দকর্ম এবং তাতে আছে বাহ্যিক সৌন্দর্য ও গভীর আকর্ষণ। এই বাহ্যিক সৌন্দর্য ও আকর্ষণকে মানব মনের কুওয়াতে হায়ওয়ানী স্বাগত জানায় যা মানুষের জন্য আদৌ হিতকর নয়। কিন্তু মূর্খ লোকেরা বিষয়টি গভীরভাবে বুঝে না। নিজেদের মনের ভিতরকার আকর্ষণবোধ পেয়েই মনে করে এটি খুব ভাল জিনিস। এই ভাল মনে করেই তারা পতিত হয় মন্দ কাজে। পরিনামে ক্রমে তার জীবনের সর্বত্র জমে উঠে নানা রকমের বিদআত। শেষযুগে বিদআত মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কি রকম ছড়াবে তার বর্ণনা দিয়ে একখানা হাদীসে বলা হয়েছে;

---

৭৩. ইমাম তিরমিযী, সূত্র ঃ মিশকাত, পৃ. ৪৫৪।
৭৪. ইমাম তিরমিযী, সূত্র ঃ মিশকাত, পৃ. ৪৫৫।

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه— قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم سيخرج فى امتى اقوام تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله رواه احمد وابو داود كذا فى المشكواة

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর রা. থেকে বর্ণিত । .. তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, শীঘ্রই আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকজনের উদ্রেক হবে যাদের শরীরের গিরায় গিরায় বিদআত পালনের প্রবনতা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে যেভাবে পাগলা কুকুর কামড় দেওয়ার বিষ দংশনকৃত ব্যক্তির শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, তার শরীরের কোন গিরা বা জোড়া অবশিষ্ট থাকে না যেখানে সেই বিষ প্রবেশ না করে[৭৫] ।

উপরোক্ত হাদীসে মহানবী সা. এর পেশকৃত উপমাটি গভীরভাবে চিন্তা করার দাবি রাখে । এ উপমা প্রমাণ করে যে, বিদআত হল পাগলা কুকুরের বিষের ন্যায় ভয়ানক ও জঘন্য জিনিস । তাছাড়া এ বিদআত যখন কারো জীবনে প্রবেশ করে তখন কুকুরের বিষের ন্যায় এটি দংশিতের জীবনের সকল ক্ষেত্রকে ক্রমে ক্রমে গ্রাস করে নেয় । মোযাহিরে হক গ্রন্থে আরো ব্যাখ্যা করা হয় যে, কুকুর দংশিত ব্যক্তি সাধারণত পানি দেখলে ভয় পায় । সামাজিক পরিভাষায় এটিকে ‘জলাতংক’ রোগ বলে । তাই সে পানি থেকে খুব দূরে থাকে । এদিকে পিপাসায় কষ্ট পায় । অবশেষে প্রচণ্ড পিপাসার্ত অবস্থায় মারা যায় । বিদআতকারীরাও তদ্রুপ । বিদআতের কারণে বিদআতীর মধ্যে ‘নাফসানী খাহেশ’ পুরনের ইচ্ছা প্রবল হতে থাকে । তার দিলের মধ্যে ‘সহীহ ইলম আতংক’ রোগ বিস্তার করে । সে সহীহ ইলমকে ভয় পায় । সহীহ ইলম থেকে দূরে থাকে । অবশেষে সহীহ ইলমের অভাবজনিত রোগে প্রচণ্ড বিভ্রান্ত অবস্থায় গুমরাহী নিয়ে মারা যেতে বাধ্য হয় ।

এভাবে বিদআত রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়লে ব্যক্তির ঈমান আকীদা ও চিন্তাধারার মধ্যেও প্রবেশ করে বিকৃতি । আর ঐ বিকৃতির মধ্যে কেটে যায় তার শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও জীবনের সকল ধাপ । ফলে গোটা জীবন ইসলামের নামের উপর বিদ্যমান থাকলেও প্রকৃত ইসলামের সাথে তার কোন সম্পর্ক গড়ে উঠে না । একজন মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় দুঃখকর আর কি হতে পারে । এই লোকদের অনেকে এমনও দেখা যায় যে, তারা নিরেট বিদআত কর্মটিকেই মনে করে শরীঅত ও সুন্নাত । আমাদের সমাজে এমন লোকও আছে যার চব্বিশ ঘন্টা দীনের নামে বিদআতের কাজে ব্যয় হচ্ছে । তিনি তো মনে মনে ভারী খুশী যে, নেক আমলে মশগুল; অন্যরাও তাকে দেখে ঈর্ষা করে যে, লোকটি কত পরহেযগার অথচ হাকীকত হলো তার ভিতর ঈমান ও আমলের লেশমাত্র নেই । সে বাহ্যিক যা পালন করে দীনদারীর খেতাব উপার্জন করছে সেগুলোর সবই হল বিদআত যার কোন মূল্য শরীঅতে নেই । আল্লাহ আমাদের হিফাযত করুন ।

এমনও হয় যে, সেই বিদআত পালন যদি কারো ছুটে যায় তখন অন্যরা তাকে লজ্জা দেয় । তাকে ধিক্কার দিয়ে বলে, হায়! কি করেছো ? তুমি তো সুন্নাত ছেড়ে দিয়েছো, ইসলাম ছেড়ে দিয়েছো । বিকৃত মুসলমানদের কাছে তখন বিদআত পালনই হবে সুন্নাত ইসলাম ও দীনদারীর বিচারের মানদণ্ড । উম্মতের এই করুণ পরিস্থিতির কথাও মহানবী সা. বলে গিয়েছেন । ইরশাদ হচেছ,

عن علقمة بن عبد الله رضى الله عنه قال كيف انتم اذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير اذا ترك منها شئ قيل تركت السنة قالوا ومتى ذالك قال اذا ذهبت علمائكم وكثرت جهلائكم وكثرت قرائكم وقلت فقهائكم وكثرت امرائكم وقلت أمنائكم والتمست الدنيا بعمل اللآخرة وتفقه لغير الدين رواه الدارمى

হযরত আলকামা থেকে বর্ণিত যে, সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. বললেন, (রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন) সেই সময়ে তোমাদের অবস্থা কী দাঁড়াবে যখন এমন দীর্ঘস্থায়ী বিপর্যয় তোমদের গ্রাস করে নিবে যে, কোন যুবক এ বিপর্যায়ের মধ্যেই বৃদ্ধে পরিণত হচেছ, ছোট বয়স্কে পরিণত হচেছ, যখন

৭৫. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, ইমাম আবূ দাউদ সূত্র ঃ মিশকাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০ ।

কোন বিদআত ছুটে গেলে বলাবলি শুরু হবে যে, তুমি সুন্নাত ছেড়ে দিয়েছো। শাগিরদরা বলল, কখন অবতরণ করবে এই বিপর্যয় ? তিনি বললেন, যখন তোমাদের সমাজে হক্কানী আলিমগণ বিদায় ক্রমে নিয়ে যাবেন, তাঁদের জায়গায় মূর্খদের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাবে, তোমাদের মাঝে ক্বারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে অথচ প্রাজ্ঞ ফকীহের সংখ্যা হ্রাস পাবে, নেতার সংখ্যা বেড়ে যাবে অথচ আমানতদার অনুগামীর সংখ্যা কমে যাবে। যখন দুনিয়ার রুটি-রোজগার তালাশ করা হবে আখিরাতের আমল দিয়ে (বিভিন্ন রকমের খতম পড়ে) এবং দীনী ইলম শিক্ষা করা হবে দুনিয়া কামাইয়ের উদ্দেশ্যে[৭৬] (অর্থাত চাকুরীর জন্য)।

অনুরূপ হাদীস হযরত হুযায়ফা রা. থেকেও বর্ণিত আছে। ইশরাদ হচেছ,

عن حذيفة رضى الله عنه قال والذى نفسى بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق الا قدر ما بين الحجرين من النور والله لتفشون البدع حتى اذا ترك منها شئ قالوا تركت السنة كذا فى القرطبى

হযরত হুযায়ফা রা. থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলছেন, সেই মহান সত্তার কসম যার হাতে আমার পাণ। বিদআত এমনভাবে প্রসার লাভ করবে যে, সত্য ও সঠিক মতটি এই দুই পাথরের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে আসা আলোর মত খুব ক্ষীণ আকারে দেখা যাবে। মহান আল্লাহর কসম! বিদআত এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করবে যে, তখন কোন বিদআত ছুটে গেলে লোকেরা বলাবলি শুরু করবে যে, হায়! তুমি তো সুন্নাত ছেড়ে দিয়েছো[৭৭]। (অর্থাৎ বিদআত পালনকেই শরীঅত ও সুন্নাত জ্ঞান করবে। বিদআতী সুন্নী হওয়ার দাবীদার হয়ে যাবে)

কিয়াতমতের পূর্বে ইসলামের সব শিক্ষা বিদায় নিবে

বিদআতের অনুপ্রবেশের পরিনামে কিয়ামতের পূর্বে ইসলামের সব শিক্ষা বিদায় নিবে। এটি একদিনে হবে না, হবে ক্রমে ক্রমে। তখন মানুষের মধ্যে ধর্ম ও ধার্মিকতা যে থাকবে না এমনটিও নয়। ধার্মিকতা থাকবে। লোকেরা ধর্মপালনও করবে। কিন্তু সেই ধার্মিকতার মধ্যে সহীহ্ ধার্মিকতার কিছুই থাকবে না। আর যা থাকবে সেটি আদৌ ধর্ম নয়। সেই ধার্মিকতা হবে পুঞ্জিভূত কতিপয় বিদআতের অনুশীলন মাত্র। তখন যে জিনিসকে লোকেরা ধর্ম ভাববে আসলে সেটি ধর্ম নয়, যে জিনিসকে পয়গাম্বরের আদর্শ মনে করবে আসলে তা পয়গাম্বরের আদর্শ নয়, যে জিনিসকে সুন্নাত মনে করবে আসলে তা সুন্নাত নয়। এহেন ধর্মহীনদের উপরই কিয়ামত আপতিত হবে। উল্লেখ্য, মানব মনের সেই গুণটির উপর ঈমান ও আমল প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে সেটিকে ঈমানের ভিত্তি বলা হয়। সেটিকে হাদীসের পরিভাষায় বলা হয়েছে 'আমানত'। এ গুণই মানব মনের উপর ঈমানকে প্রতিষ্ঠিত করে। কোন সন্দেহ নেই, ভিত্তি মজবুত হলে তার উপর স্থাপিত প্রাসাদও মজবুত হয়। ভিত্তি নষ্ট হলে প্রাসাদও নষ্ট হয়ে যায়। এটাই সাধারণ নিয়ম। মহান আল্লাহ মানব মনে প্রথমতঃ ঈমানের ভিত্তি আমানত পয়দা করেছেন। তারপর এই আমানতের উপর ঈমান ও আমলের প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন। এভাবে গড়ে উঠে ইসলামের সমাজ। তারপর আবার আলাহ্ জালা শানুহু যখন ঈমানের বিলুপ্তি ঘটাবেন তখন প্রথমতঃ মানব মনে অবস্থিত আমানতকে দুর্বল বরং নষ্ট করে দিবেন। ফলতঃ ক্রমে ঈমান ও আমলের প্রাসাদও একদিন ভেঙ্গে পড়বে, এক পর্যায়ে এই প্রাসাদ গুড়িয়ে যেতে বাধ্য হবে। একখানা হাদীসে আছে,

عن حذيفة رضى الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت احدهما وانا انتظر الآخر حدثنا ان الامانة نزلت فى جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الامانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الامانة من قلبه فيظل اثرها مثل الوكت ثم ينام النومة فتقبض الامانة من قلبه فيظل اثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شئ ثم اخذ حصى فدحرجه على رجله

৭৬. আদ দারেমী, আস সুনান, খ. ১, পৃ. ৬৪।
৭৭. আল কুরতবী, পৃ. ৫৮।

فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد احد يؤدى الامانة حتى يقال ان فى بنى فلان رجلا أمينا حتى يقال فى الرجل ما اجلده وما اعقله وما فى قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان   رواه مسلم

হযরত হুযায়ফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. আমাদের সামনে দুখানা হাদীস (ঈমান মানুষের অন্তরে কিভাবে স্থাপিত হয়েছে এবং কিভাবে অন্তর থেকে উঠে যাবে সেই বিষয়ে) বলে গিয়েছেন। আমি তম্মধ্যে একখানা হাদীসের বাস্তবতা স্বচোক্ষে অবলোকন করছি। আর অপর হাদীসের বাস্ত বতা দেখার অপেক্ষা করছি। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আমানত অর্থাৎ ঈমানের ভিত্তি (প্রথমতঃ) নাযিল হয়েছে মানব হৃদয়ের মূলবিন্দুতে। (তাতে মানুষ সত্য ও ন্যায়কে চেনা ও কবুল করার যোগ্যতা লাভ করল) তারপর সেই দিলের উপর নাযিল করা হল পবিত্র কুরআন। ফলে লোকেরা পবিত্র কুরআন থেকে আল্লাহ জালা- শানুহুর হুকুম শিখল এবং মহানবী সা. এর সুন্নাহ থেকে সেই হুকুমের বাস্তবায়ন তরীকা জেনে নিল। (এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হল ঈমান ও ঈমানের পরিবেশ- যা হযরত হুযায়ফা রা. স্বচক্ষে দেখেছেন বলে মন্তব্য করেছেন)। তিনি বলেন, অতপর রাসূলুলাহ সা. এই আমানত উঠিয়ে নেওয়ার প্রসঙ্গে বলেন, তারপর ক্রমে মানুষ উদাসীনতার নিদ্রা (সুন্নাত থেকে গাফিল হওয়া এবং বিদআত ও খোরাফাত ইত্যাকার জিনিস সম্পর্কে অসচেতনতার জীবন) যাপন করবে তো তার দিল থেকে আমানতের কিয়দাংশ তুলে নেওয়া হবে। তখন তার জীবনে আমানতের বাহ্যচিহ্ন হিসাবে অবশিষ্ট থাকবে একটি কালো দাগ মাত্র। তারপর সে আবার উদাসীনতার নিন্দ্রা যাপন করবে তো দিল থেকে আমানতের আরো কিয়দাংশ তুলে নেওয়া হবে। তখন তার জীবনে বাহ্যচিহ্ন হিসাবে অবশিষ্ট থাকবে ফোস্কার মত কিছু জিনিস। হযরত হুযায়ফা রা. একটি উদাহরণ দিয়ে বললেন, তোমার পায়ে জলন্ত এ অঙ্গারের ঘষা লাগলে যেভাবে ফোস্কা উঠতে দেখ, ফোলা ও মোটা অথচ ভিতরে কিছু নেই তদ্রুপ। কথাটি বলে মহানবী সা. নিজ পায়ে একটি কংকর ঘষেও আমাদেরকে দেখালেন। এভাবে দিল থেকে আমানত উঠিয়ে নেওয়ার পর লোকেরা জাগতিক কাজকর্ম সবই করবে। কিন্তু কেউ দীন ও ঈমানের আদর্শ কিছুই মান্য করবে না। পরিস্থিতি অবনতির এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছবে যে, লোকেরা বলাবলি করবে যে, অমুক গোত্রে একজন মজবুত ঈমানদার ব্যক্তি আছেন, কিংবা কারো ব্যাপারে লোকেরা বলবে, বাহ! ইনি কত সচেতন, কত বুদ্ধিমান, কত দীনদার। অথচ সেই লোকটিরও বাস্ত ব হাল হবে যে, তার দিলে শষ্য দানা পরিমানেও ঈমান বিদ্যমান নেই। (মোট কথা দীনদারী ও ঈমানের ব্যপারে সুপরিচিত মানুষটির যেখানে এই অবস্থা সেখানে যাদের আদৌ পরিচিতি নেই তাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে?)

এভাবে ক্রমে সুন্নাতগুলো বিদায় নিতে থাকলে এক সময় এমন হবে যে, সুন্নাতের নাম নেওয়ার মতও কেউ থাকবে না। মুসলমান থাকবে, তবে নামের মুসলমান। হয়ত তাদের মসজিদ মাদ্রাসা সবই থাকবে কিন্তু ইসলাম ও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা, সুন্নাত ও সুন্নাতের আমল থাকবে না। ইসলামের এই সুন্নাতগুলো তখন বুড়ো বুড়িদের বলা কওয়া পুরান কালের গল্পের মত হয়ে যাবে। হাদীসে আছে,

عن حذيفة رضى الله عنه قال يدرس الاسلام كما يدرس وشى الثوب لا يبقى الا شيخ كبير او عجوز فانية يقولون قد كان قوم يقولون لا اله الا الله وهم ما يقولون لا اله الا الله كذا فى شرح المسند للامام الاعظم

হযরত হুযায়ফা রা. থেকে বণিত। তিনি বলেন, ক্রমে ক্রমে ইসলাম (মানুষের জীবন থেকে) এভাবে মিটতে থাকবে যেভাবে কাপড় থেকে কাপড়ের রং মিটে থাকে। অবশেষে দুনিয়ায় কিছু বুড়া-বুড়ি থাকবে যারা (গল্পের মত নিজেদের নাতি পুতিদের শুনিয়ে) বলবে, পুরানকালে কিছু লোক ছিলেন যারা 'লা ইলাহা ইলালাহ' বলতেন। আর এই বুড়া-বুড়িও এমন যারা নিজেরা কখনো লা ইলাহা ইলালাহ (যে কি জিনিস তা বুঝে না বা) পড়ে না[৭৮]।

এভাবে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা যখন উঠে যাবে এবং সুন্নাতহীনতায় যখন দুনিয়া ভরে যাবে তখন দুনিয়ায় অবশিষ্ট থাকবে কেবল সে সব লোক যারা সৃষ্ট জগতের অধম। হাদীসে রাসূল সা. এদেরকে

৭৮. মুসনাদে ইমাম আযম, পৃ. ২৭৬।

'শিরারুল খালক' নামে অভিহিত করেছেন। এই শ্রেণীর লোকদের ধর্ম পরিচয় মুসলমান থাকলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তারা হবে ধর্মহীন ও মুশরিক। তাদের উপরই কায়িম হবে কিয়ামত। ইরশাদ হচেছ,

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق

رواه مسلم كذا فى المشكواة

হযরত আবদুলাহ ইবন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন যে, সৃষ্টির অধপতিত অধম শ্রেণীরই উপর কিয়ামত কায়িম আপতিত হবে[৭৯]।

عن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى يعبد اللات والعزى فقلت يا رسول الله ان كنت لاظن حين انزل الله هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ان ذالك تاما قال انه سيكون من ذالك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون الى دين آبائهم رواه مسلم كذا فى المشكواة

হযরত আইশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত দিবস রজনীর আবর্তন বন্ধ (কিয়ামত) হবে না যতক্ষণ না (দুনিয়ায় দেবদেবী তথা) লাত ও উযযার ইবাদত পুনরায় শুরু হবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুলাহ সা.! যখন মহান আলাহর নিম্মোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছিল তখন আমার ধারনা হয়েছিল যে, এ দীন (কিয়ামত পর্যন্ত) পূর্ণতার সাথে বিদ্যমান থাকবে। (অর্থাৎ লোকেরা আর শিরকে ফিরে যাবে না) আয়াতটি হল এই;

هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون

তিনিই নিজ রাসূল সা.কে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দীনসহ সকল দীনের উপর তা বিজয়ী করার জন্য যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে[৮০]।

তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, আয়াতের বাস্তবতা মহান আল্লাহ যতটুকু ইরাদা করবেন শীঘ্রই ততটুকু বাস্তবায়িত হবে। (সর্বত্র ইসলাম ও সুন্নাহ প্রতিষ্ঠিত হবে ও বিদ্যমান থাকবে) তারপর আল্লাহ প্রেরণ করবেন একধরনের ছায়াময় বায়ূ। ফলে যাদের দিলে শরিষা দানা পরিমানও ঈমান থাকবে তারা মারা যাবে। অতঃপর ভূপৃষ্ঠে অবশিষ্ট থাকবে এমন লোকেরা যাদের নসীবে কোন কল্যাণ নেই। তারা প্রত্যাবর্তন করবে তাদের পূর্বসুরুষদের জাহেলী ধর্মের দিকে[৮১]।

তাই মুসলমান সাবধান ! বিদআত থেকে বেঁচে থাকো

বিদআতের উপরোক্ত মন্দ পরিনতির কারণে রাসূলুল্লাহ সা. উম্মতকে বার বার সাবধান করে গিয়েছেন যে, তোমরা বিদআত থেকে যথাশক্তি বেঁচে থাকো। উম্মত যেন কোথাও কোন ধরনের প্রতারণার শিকার না হয় সেই লক্ষ্যে বিদআত কি জিনিস, কিভাবে বিদআত কোন জাতির জীবনে অনুপ্রবশে করে, ভবিষ্যতে এটি মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কোন কোন পথে ঢুকবে, উম্মাহকে কোন কোন দিক থেকে কি কি উপায়ে কি ধরনের পোষাক পরিধান করে ধোকা দিতে আসবে ইত্যকার সবই রাসূলুলাহ সা. ব্যক্ত করে গিয়েছেন। উম্মতের প্রতি তাঁর অপার হে মমতাই তাঁকে এ সব দিকনির্দেশনা প্রদানে বাধ্য করেছিল। মহানবী সা. বিদআতের বিষয়ে উম্মতকে যেমন সাবধান করে যান তেমনি পূর্বের নবীগণের ন্যায় কোন কবর

৭৯. ইমাম মুসলিম, সূত্র ঃ মিশকাত, পৃ. ৪৮১।
৮০. সূরা সাফ, ৬১ ঃ ৯।
৮১. সহীহ মুসলিম, সূত্র ঃ মিশকাত, পৃ. ৪৮১।

এমনকি তাঁর নিজের কবরকে পুজি করে উম্মতের মধ্যে বিদআত যেন শুরু হতে না পারে সেজন্য অসিয়্যতও করেন। মহানবী ওফাতের মুহূর্তে খুব শক্তভাবে নির্দেশ দিয়ে বলেন যে, তোমরা আমার কবরকে মসজিদে পরিণত করো না। ইয়াহূদ নাসারার প্রতি আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক। কারণ তারা নিজ পয়গাম্বরদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছিল[৮২]।

কিতাবে বিদআত থেকে সাবধান থাকার মর্মে বর্ণিত মহানবী সা.-এর বহু হাদীস বিদ্যমান। তম্মধ্যে কয়েকটি যেমন,

عن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والمحدثات فان كل محدثة ضلالة رواه ابو داود

হযরত ইবরায ইবন সারিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, সাবধান, তোমরা বিদআত থেকে বেঁচে থাকো। কেননা সব বিদআতেরই পরিণতি বিভ্রান্তি[৮৩]।

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا واياكم ومحدثات الامور فان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه ابن ماجة

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, সাবধান। সাবধান। বিদআত থেকে তোমরা সাবধান থাকো। কারণ নিকৃষ্টতম কাজ হল বিদআত। সব নতুন জিনিসই বিদআত। আর সব বিদআতই গুমরাহী[৮৪]।

উম্মতকে বিদআত থেকে সাবধান করার বিষয়টি মহানবী সা.-এর কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল হযরত জাবির রা. বর্ণিত হাদীস থেকে তা অনুমান করা যায়। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখনই কোন বক্তৃতার জন্য দাঁড়াতেন তখন ভূমিকার মধ্যে প্রথমেই সুন্নাহর অনুসরণ ও বিদআত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ শোনাতেন। তারপর অন্য কথা বলতেন। বক্তৃতার শুরুতেই এই কথাটি বলা এবং প্রত্যেক বক্তৃতার মধ্যে কথাটি পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা কথাটির অমান্য গুরুত্বের দিকে ইশারা করছে। আফসুস উম্মতের কোন কোন লোক তা বুঝতে চায় না। মহানবী সা.-এর অনুসরণে পরবর্তীকালে সাহাবীগণ যে যেখানে ছিলেন প্রত্যেকে স্ব স্ব যুগের মানুষকে বিদআত থেকে সাবধান থাকার নির্দেশ দিয়ে যান। আরো পরে তাবিয়ী ও তাবি তাবিয়ীগণও অনুরূপে বিদআত থেকে লোকজনকে সাবধান করে যান। হাদীসে আছে,

عن عثمان بن الهادى عن بن عباس رضى الله عنه قال نعم عليك بتقوى الله والاستقامة واتبع ولا تبتدع رواه الدارمى فى المقدمة

হযরত উসমান ইবন হাদি রহ. বলেন, সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস আমাকে উপদেশ দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, তুমি আলাহ্ জালা- শানুহুকে ভয় করে চলবে এবং ইসলামের বিধি-বিধান পালনে দৃঢ় অবিচল থাকবে। সুন্নাত অনুসরণ করবে, বিদআত করবে না[৮৫]।

عن ابن مسعود رضى الله عنه انه قال فعليكم بالعلم واياكم والتبدع واياكم والتنطع واياكم والتعمق وعليكم بالعتيق رواه الدارمى فى المقدمة

৮২. সহীহ বুখারী, খ. ১, পৃ. ৩২।

৮৩. ইমাম আবু দাউদ, হাদীস ৪৬০৭, ইমাম তিরমিযী, হাদীস ৬২৭৬, ইমাম ইবন মাজা, হাদীস- ৪২, ইমাম ইবন হিব্বান, হাদীস- ৫, মুনাযিরী, হাদীস ৮৬, পৃ. ২২।

৮৪. ইমাম ইবন মাজা, হাদীস ৪৫।

৮৫. ইমাম দারেমী, মুকাদ্দিমা ১৩৯।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে। তিনি উপদেশ দিয়ে বলেন যে, তোমরা অবশ্যই ইলম শিখবে। আর খবরদার! কখনো বিদআতে লিপ্ত হয়ো না। খবরদার! বাড়া-বাড়িতে লিপ্ত হয়ো না। খবরদার! অতিশয় গভীরতায় যেতে চেষ্টা করো না। তোমরা পূর্বসূরীদের চলাপথকে আঁকড়ে ধরে রাখো[৮৬]।

বিদআত লেকে বেঁচে থাকার উপদেশ দিয়ে হিজরী প্রথম সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ হযরত উমর ইবন আবদুল আযীয রহ. জনৈক ব্যক্তির এক চিঠির জবাবে লিখেছেন,

اوصيك بتقوى الله والاقتصاد فى امره واتباع سنته وترك ما احدثه المحدثون بعد ما جرت به سنته وكفوا مؤنته فعليك

بلزوم السنة فانها لك باذن الله عصمة   رواه ابو داود فى كتاب السنة

আমি তোমাকে অসিয়্যত করছি তুমি আল্লাহ জাল্লা শানুহুকে ভয় কর। তাঁর বিষয়ে পরিমিত পথ অনুসরণ করে চল। তাঁর নবী হযরত রাসূলুল্লাহ সা. এর সুন্নাত অনুসরণ কর। সুন্নাত প্রচলিত হওয়ার পর লোকেরা যে সব নতুন কাজের সৃষ্টির করেছে সেগুলো সম্পূর্ণ পরিহার কর। নতুন এ সব কাজ সৃষ্টির কোন প্রয়োজন ছিল না। কাজেই তুমি সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। ইনশা আল্লাহ সুন্নাতই তোমাকে হিফাযত করবে[৮৭]।

বিদআত থেকে সাবধান করে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ হযরত শায়খ আহমদ সারহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. বিদআতের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। মুজাদ্দিদিয়্যা তরীকার প্রধান বৈশিষ্টই হল সুন্নাতের লালন ও বিদআতের উচ্ছেদ সাধন। এই তরীকার বুযর্গগণ বরাবরই বৈশিষ্টটি ধরে রেখেছেন যদিও বর্তমানে কোথাও কোথাও উদাসীনতা নেমে আসছে। হযরত মুজাদ্দিদ রহ. লিখেছেন, শ্রেষ্ঠ নসীহত যা আমি আমার পুত্র ও বন্ধুদের কাছে পেশ করছি তা হল, তোমরা সুন্নাতের অনুসরণ করো ও বিদআত থেকে বেঁচে থাকো। ইসলাম ধর্ম দিন দিন অপরিচিত মুসাফির হতে চলছে। খাঁটি মুসলমানের সংখ্যা কমে যাচেছ। এভাবে খাঁটি মুসলমানদের ওফাত হয়ে গেলে জগতে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলার কেউ থাকবে না। সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যে ইসলামের এই দুরবস্থার সময়ে সমাজের লোকজনের কাছে পরিত্যক্ত কোন সুন্নাতকে জীবন্ত করে এবং প্রচলিত কোন বিদআত উচেছদ সাধন পূর্বক সমাজকে পাক পবিত্র করে[৮৮]।

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه انه قال ان من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأجذة المؤمن

والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر فيوشك قائل ان يقول ما للناس لا يتبعونى وقد قرأت القرآن ما

هم بمتبعى حتى ابتدع لهم غيره فاياكم وما ابتدع فان ما ابتدع ضلالة رواه ابو داود

হযরত মুআয ইবন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত। --- তিনি বলেন, (মহানবী সা. ইরশাদ করেছেন যে,) তোমাদের সম্মুখে আছে অনেক ফেতনা ফাসাদ। যখন মানুষের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। মানুষের কাছে কুরআন শিক্ষার (সহজ) পথ খুলে যাবে। মুমিন মুনাফিক, নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, চাকর-মনিব সবাই কুরআন শিখবে। তখন হয়ত কেউ বলবে, মানুষের যে কি হল? আমি কুরআন শিখলাম অথচ লোকেরা আমাকে ইজ্জত করছে না। যতক্ষণ না আমি নতুন কোন বিদআতের প্রচলন ঘটাচ্চি। (অর্থাৎ তার ধারনা হবে যে, আমি এত বড় আলিম হলাম অথচ মানুষের কাছে কোন মূল্যায়ন পাচিছ না, আমার ভক্তের সংখ্যা বাড়ছে না। ভক্তের সংখ্যা বাড়াতে হলে আমাকে নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে হবে) তাই খবরদার! বিদআতের কাছেও যাবে না। বিদআত হিসাবে যা কিছু উদ্ভাবন করা হয় সবই গুমরাহী[৮৯]।

---

৮৬. ইমাম দারেমী, মুকাদ্দিমা, ১৪২।

৮৭. ইমাম আবূ দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, পৃ. ৩৯৯৬।

৮৮. মাকতূবাত শরীফ, ২য় খণ্ড, মাকতুব নং-২৩।

৮৯. ইমাম আবূ দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, হাদীস-৩৯৯৫।

সুন্নাতের আমল ও সাহাবীগণের অনুসরণই নাজাতের একমাত্র পথ

মানব জীবনে দীনদারী চর্চা করা তথা ঈমান ও আমলের মেহনত করার প্রধান উদ্দেশ্য হল মহান মাওলা পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা ও মওতের পর আখিরাতে নাজাত লাভ করা। কেউ যদি জীবন ভর কোন নেক আমল সম্পাদন করল, জাগতিক সকল কষ্ট ও ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে আমলকে অব্যাহত রাখল অথচ মৃত্যুর পর দেখা গেল যে, উদ্দেশ্যের কিছুই সাধিত হয়নি অধিকন্তু জীবনের সবই বৃথা হয়ে গিয়েছে, আর এমন ভাবে বৃথা হয়েছে যে, সেখান থেকে গোড়ায় ফিরে এসে পুনরায় কাজ করার সুযোগও নেই- সে লোকটির মত দুঃখী মানুষ জগতে আর নেই। আমরা যে ঈমান ও আমলের মেহনত করি, ইসলাহে বাতিনের সাধনা করি, ইত্তিবায়ে সুন্নাত ও হিফাযতে ঈমানের চেষ্টা করি- এ সবের উদ্দেশ্য পরকালের কামিয়াবী অর্জন। আমরা নিশ্চিত জানি, আমাদেরকে মরতে হবে, একদিন করবে গিয়ে জবাবদেহীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। কবরে গিয়ে শুরু হবে আমাদের অনন্ত কালের জীবন। সেখানে চলে যাওয়ার পর সেখান থেকে দুনিয়ায় ফিরে আসার কোন অবকাস নেই। সেই জীবনে আছে হয়ত জান্নাত নয়তো জাহান্নাম। মওতের পর জাহান্নাম থেকে রেহাই পাওয়া ও জান্নাত লাভ করাই হল একজন মানুষের সবচেয়ে বড় সফলতা। ইরশাদ হচ্ছে;

فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور

যাকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে সে-ই সফলকাম, পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়[৯০]।

আখিরাতের জীবনে কাউকে নাজাত দেওয়া বা না দেওয়ার এখতিয়ার একমাত্র আলাহ্ জালাশানুহুর। তিনি ছাড়া অন্য কেউ সেখানে কিছুই করতে পারবে না। তিনি কাকে নাজাত দিবেন এবং কোন মানদণ্ডের ভিত্তিতে নাজাত দিবেন তাও স্থির করার অধিকার একমাত্র তাঁর। অনুরূপ তিনি যে মানদণ্ড স্থির করে দিবেন সেটিই সেখানে কার্যকর হবে। সেই মানদণ্ডের বাইরে অন্য কিছু সেখানে চলবে না, চলার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই মহান আল্লাহর দেওয়া মানদণ্ডের বাইরে দুনিয়ার লোকেরা যত পথই উদ্ভাবন করুক না কেন- কোনই পথই মানুষেকে নাজাত দিবে না, দিতে সক্ষম হবে না। একমাত্র মহান আল্লাহর দেওয়া মানদণ্ড ব্যতিরেকে। আল্লাহর দেওয়া সেই মানদণ্ড হল মহানবী সা. এর সুন্নাহ ও সাহাবীগণের জীবন পদ্ধতির অনুসরণ। সুন্নাতের উপর আমল এবং সুন্নাতের সীমারেখা উপেক্ষাপূর্বক বিদআতে গমন না করাই একজন মানুষকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারে ও জান্নাতে পৌঁছাতে পারে। পক্ষান্তরে সুন্নাতের উপর আমল না করা কিংবা সুন্নাতের সীমারেখা উপেক্ষা করে বিদআতী কাজে লিপ্ত হওয়ার পরিণতি নিশ্চিত জাহান্নাম। পবিত্র কুরআনে কথাটি স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেন পরে কেউ কোন আপত্তি করতে না পারে। ইরশাদ হয়েছে,

تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ذالك الفوز العظيم ومن

يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين

এগুলো হল আল্লাহর দেওয়া নির্ধারিত সীমানা। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটি হল মহাসাফল্য। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হবে এবং তাঁর দেওয়া সীমানা লংঘন করবে তাকে তিনি অগ্নিতে (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি[৯১]।

---

৯০. আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান ৩ ঃ ১৮৫।

৯১. সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৩-১৪।

পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে সুন্নাতই হল 'হক' কিংবা 'নাহক' বিচার করার একমাত্র মানদণ্ড। কখনো কোন বিষয়ে মতনৈক্য দেখা দিলে কিংবা কোন বিষয়ে সংশয় সৃষ্টি হলে সে বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালাও দিবে মহানবী সা. এর সুন্নাহ। ইরশাদ হচেছ,

يايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم فى شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذالك خير واحسن تأويلا

হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে থাকো তাহলে আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর তাঁর রাসূলের এবং তাঁদের যারা তোমাদের (ধর্মীয়) দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ। তোমাদের কোন বিষয়ে মতভেদ ঘটলে তা তোমরা উপস্থাপন কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সমীপে। এটিই উত্তম ও পরিণামে প্রকৃষ্টতর পদ্ধতি[৯২]।

মহানবী সা. এর জীবনকালে উম্মতের মাঝে যখন কোন মতভিন্নতা ও এখতিলাফ দেখা দিয়েছে তখন এই এখতিলাফের সমাধান দিয়েছেন মহানবী সা.। আজ মহানবীর অনুপস্থিতির সময়ে সেই সমাধান প্রদানের জন্য রয়েছে তাঁর হাদীস ও সুন্নাহ। উল্লেখ্য প্রত্যেক যুগে সুন্নাহ যেন এই সমাধান দিয়ে যেতে পারে সে জন্যই হাদীস ও সুন্নাহকে আল্লাহ জাল্লা শানুহু কিয়ামত পর্যন্ত হিফাজতের যিম্মাদারী গ্রহণ করে আছেন। সুন্নাতের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং সাহাবীগণের জীবনাদের্শের বাইরে গিয়ে যেই পথই অবলম্বন করা হোক না কেন- সেখানে নাজাত নেই, সেখানে কামিয়াবী নেই, বরং সেটি হল হালাকতের পথ সেটি হল জাহান্নামের পথ। ইরশাদ হচেছ,

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نؤله ما تولى ونصله جهنم وسائت مصيرا

কারো কাছে সৎ (সুন্নাতের) পথ প্রকাশিত হওয়ার পর সে যদি রাসূল (ও তাঁর সুন্নাহর) বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অবলম্বন করে চলে তাহলে যেদিকে সে ফিরে যাচেছ আমি সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং তাকে দগ্ধ করবো জাহান্নামে, আর তা হবে কতই না মন্দ আবাস[৯৩]।

একখানা হাদীসে আছে,

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطاعنى فقد اطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله

হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার (সুন্নাতের) অনুসরণ করল সে মহান আল্লাহর অনুসরণ করল। আর যে আমার (সুন্নাতের) নাফরমারী করল সে মহান আল্লাহর নাফরমানী করল[৯৪]।

প্রত্যহ নামাযের মধ্যে আমরা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে নিজেদেরকে 'সিরাতে মুস্তাকীম'এর উপর চালানোর জন্য আবেদন করি। যতবার সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করি ততবারই আমরা এ আবেদন পেশ করে যাচিছ। কথা হল সিরাতে মুস্তাকীম জিনিসটি কি? পবিত্র কুরআন স্পষ্ট বলছে যে, সিরাতে মুস্তাকীম অন্য কিছু নয়, সেটি হল সুন্নাতের পথ, সুন্নাতের আমল। এটি সরল পথ। সোজা জান্নাতে পৌঁছে যাওয়ার পথ। আর এটিই একমাত্র পথ, অন্য কোন পথে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সা. রীতিমত একটি চিত্র অংকন করে বুঝিয়ে গিয়েছেন। ইরশাদ হচেছ,

---

৯২. সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৯।

৯৩. সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১৫।

৯৪. ইমাম ইবন মাজা, আস সুনান, হাদীস ৩।

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده فى الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الاية وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بهم عن سبيله رواه ابن ماجه

হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মহানবী সা.-এর নিকট উপস্থিত। এমন সময়ে তিনি একটি লম্বা দাগ আঁকলেন। তারপর সেই দাগটির ডানদিকে দুটি দাগ আঁকেন এবং বাম দিকে দুটি দাগ আঁকেন। তারপর মধ্যখানে অবস্থিত লম্বা দাগটির উপর হাত রেখে বললেন, এটি হল আল্লাহর (মনোনীত সোজা) পথ। তারপর নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন,

وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بهم عن سبيله

এই পথই আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করবে। এর বাইরে অপরাপর পথের অনুসরণ করবে না। যদি অপরাপর পথের অনুসরণ কর তবে এগুলো তোমাদেরকে সরল পথ থেকে বিচিছন্ন করে দিবে[৯৫]।

উপরোক্ত হাদীস প্রমাণ করছে যে, মহানবী সা. এর রেখে যাওয়া সুন্নাতের পথই হল সোজা পথ। এ পথের ডানে বামে আছে মানুষের বানানো আরো বিভিন্ন পথ। মানুষের বানানো বিভিন্ন পথ, প্রথা প্রচলন ইত্যাদির অনুসরণ ব্যক্তিকে সোজা পথে চলার নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করে দেয়। তাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করে। কোন সন্দেহ নেই এতদসত্তেও যুগে যুগে মানুষ মহানবীর সুন্নাতের পথকে এড়িয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে নানা রকমের পথ বানাবে। নানা রকমের বিদআত আবিস্কার করবে। বিদআতের সেই পথগুলো হবে বিভ্রান্তির পথ। একখানা হাদীসে মহানবী নিজ উম্মতের মধ্যে ঘটিতব্য সেই বিভ্রান্ত দলগুলোর সংখ্যা ও চরিত্রও আলোচনা করেন এবং স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, এ সুন্নাতের আমল ও সাহাবীগণের জীবনাদর্শের অনুসরণই নাজাতপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়।

ইরশাদ হচেছ,

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بنى اسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق امتى على ثلث وسبعين ملة كلهم فى النار الا ملة واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابى رواه الترمذى كذا فى مشكواة المصابيح

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, বনী ইসরাঈলের লোকেরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে তেহাত্তর দলে (একটি বেশী)। দলগুলোর সবই যাবে জাহান্নামে একটি ব্যতীত। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! যেটি ব্যতীত সেই দলটি কোনটি? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, সেটি হল আমার সুন্নাহ ও আমার সাহাবীদের জীবনাদর্শের উপর দৃঢ়তার সাথে অবস্থানকারীদের দল[৯৬]।

عن معاوية رضى الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا ان من كان قبلكم من اهل الكتاب افترقوا على ثنتين و سبعين ملة وان هذه الامة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة وهى الجماعة رواه احمد وابو داود

হযরত মুআবিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সা. আমাদের মধ্যে বক্তৃতার জন্য দাঁড়িয়ে বললেন, মনে রেখ, তোমাদের পূর্বে আহলে কিতাবের যারা ছিল তারা বিভক্ত হয়েছিল বাহাত্তর

---

৯৫. সূরা আনআম, ৬ ঃ ১৫৩; দ্র. ইমাম ইবন মাজা, আস সুনান, হাদীস- ১১।
৯৬. ইমাম তিরমিযী।

দলে। আর এই মুসলিম উম্মাহ শীঘ্রই বিভক্ত হবে তেহাত্তর দলে। তম্মধ্যে বাহাত্তর দল হবে জাহান্নামী, আর মাত্র একটি দল হবে জান্নাতী। এই দলটি হল সাহাবীগণের অনুসরণকারী দল[৯৭]।

সাহাবায়ে কিরামের জামাআত গোটা উম্মতের শ্রেষ্ঠতম জামাআত। তাঁরা গুনাহ ও সর্বপ্রকার নাফরমানী থেকে মাহফুয তথা সংরক্ষিত। আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাদেরকে কোন অন্যায় বা অসত্যের উপর বলবৎ থাকা হতে হিফাযত করেছেন। তাঁদের জীবন ধারাকে পছন্দ করেছেন। তাঁদের ঈমান ও আমলকে পরিশোধিত ও পরিচ্ছন্ন করে গড়ে তুলে নিজের সর্বময় সন্তুষ্টির সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন এবং খাতিমা বিল খায়র নসীব করেছেন। তাঁদের ঈমানকে আল্লাহর নিকট গৃহীত ঈমানের এবং তাদের আমলকে আল্লাহর নিকট গৃহীত আমলের মানদণ্ড বলে ঘোষণা দিয়েছেন। একখানা হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহ সৃষ্টির আদিতেই (রূহ জগত থেকে) সাহাবাগণের এই মুবারক জামাআতকে নিজ পছন্দসই 'ঈমান ও আমলের আদর্শ' হিসাবে ভূমিকা পালন করার জন্য নির্ধারণ করেন। তাই রূহ জগত থেকেই তাঁদের ব্যতিক্রম মর্যাদা শুরু হয়েছে। সাহাবী হযরত আবদুলাহ ইবন মাসউদ রা. সাহাবীদের এই জামাআতকে উম্মতের জন্য অনুকরণের একমাত্র আদর্শ হিসাবে বর্ণনা করেন। ইরশাদ হচেছ,

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات فان الحى لا تؤمن عليه الفتنة اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا افضل هذه الامة ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولاقامة دينه فاعرفوا فضلهم واتبعوا على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم رواه رزين كذا فى مشكواة المصابيح

হযরত আবদুলাহ ইবন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি কোন পথ বা পদ্ধতির অনুসরণ করতে চাইলে সে যেন পরলোকগত মনীষীগণের পথ পদ্ধতি অনুসরণ করে। কেননা যারা এখনো জীবিত তারা বিভ্রান্তির কবলে পতিত হওয়া থেকে আশংকামুক্ত নয়। আমার উদ্দেশ্য হল মুহাম্মাদুর রাসূলুলাহ সা.-এর সাহাবীগণের অনুসরণ করার কথা বলা। তাঁরা ছিলেন এই উম্মতের শ্রেষ্ঠতম জামাআত। তাঁদের হৃদয়গুলো ছিল সর্বাপেক্ষা পবিত্র, ইলম ছিল সর্বাপেক্ষা গভীর এবং তাঁদের জীবন ও চরিত্রে কৃত্রিমতা ছিল সবচেয়ে কম। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে নিজ নবীর সাহচর্যের জন্য, নিজ দীনের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা তাঁদের মযাদা হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা কর, তাদের পদাংক অনুসরণ কর এবং তাদের জীবনাদর্শ ও চরিত্রের যতখানি সম্ভব দৃটভাবে ধরে রাখতে সচেষ্ট হও। কেননা তাঁরাই ছিলেন হিদায়াত ও সরল পথের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত[৯৮]।

হযরত ইবন মাসউদ রা. সাহাবীগণের পথ ছেড়ে ডানে বামে বা অন্য কোন দিকের পথ অবলম্বন করার ক্ষতিও পরিস্কার ভাষায় ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন,

لئن اتبعتموا القوم لقد سبقوا سبقا مبينا ولئن جزتم يمينا او شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا

যদি তোমরা সাহাবীগণের অনুসরণ কর তবে সফলতা পাবে। কারণ তারই তোমাদের চেয়ে উত্তম ও অগ্রগামী ছিলেন। আর যদি তোমরা (নিজেদের পক্ষ থেকে নানা রকম বিদআত সৃষ্টি করে) তাঁদের পথ থেকে ডানে কিংবা বামে হেলে যাও তাহলে (সাবধান!) তোমরা পতিত হবে কঠিন গুমরাহীর মধ্যে[৯৯]।

যতটুকু বিদআত ঢুকে ততটুকু সুন্নাত উঠে যায়

সুন্নাত ও বিদআত একটি অপরটির বিপরীত। উভয় এক স্থানে একত্রিত হতে পারে না। সুন্নাত আসলে বিদআত থাকবে না। আর বিদআত আসলে সুন্নাত থাকবে না। শরীঅত ও দীনদারীর যা কিছু আছে

৯৭. ইমাম আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪৫৯৭, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল, আল মুসনাদ, খ. ৪, পৃ. ১০২।
৯৮. ইমাম রেযীন, সূত্র ঃ মিশকাত, পৃ. ৩২।
৯৯. ইবন কাছীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ. পৃ ১১।

আপাদমস্তক সুন্নাত দিয়েই গঠিত। মানুষের এমন কোন কাজ নেই যেখানে সুন্নাতের নিয়ম না আছে। কাজটি ঐ সুন্নাতের নিয়মে সম্পাদন করাই হল ইসলামের হুকুম। কাজটি যদি সুন্নাতের নিয়মে সম্পাদন করা না হল কিংবা সুন্নাতের বরখেলাফ পদ্ধতিতে করা হল তাহলে সেটি হবে বিদআত। এ কারণে ধর্মচর্চার অঙ্গনে বিদআতকে সুযোগ দিলে সে স্থল থেকে সুন্নাত বিদায় নিয়ে যায়। যেই যেই ক্ষেত্রে বিদআতকে সুযোগ দেওয়া হবে সেই সেই ক্ষেত্র থেকে সুন্নাত বিদায় নিবে। আবার যতটুকু পরিমাণ বিদআতকে সুযোগ দেওয়া হবে ততটুকু পরিমাণ সুন্নাত বিদায় নিবে। ফলত কোন মানুষের দীনদারীর আপাদমস্তকই যদি বিদআত হয় তাহলে সে হবে সবচেয়ে হতভাগা। কারণ তার গোটা দীনচর্চাই হল সুন্নাত থেকে বঞ্চিত। পূর্বেই বলা হয়েছে, আল্লাহর কাছে সুন্নাত দামী আর বিদআত ঘৃনিত। সুন্নাতের পরিনাম জান্নাত আর বিদআতের পরিনাম জাহান্নাম। ব্যক্তির জীবনে যতটুকু বিদআত ঢুকে সে ততটুকু সুন্নাত থেকে বঞ্চিত, সে ততটুকু জাহান্নামের কাছে পৌঁছে যায়, সে ততটুকু জান্নাত থেকে দূরে সরে যায়। হাদীসে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে,

عن غضيف بن الحارث الثمالى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث قوم بدعة الا رفع مثلها من السنة فتمسك بسنة خير من احداث بدعة رواه احمد كذا فى مشكواة المصابيح

হযরত গুদায়ফ ইবনুল হারিস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, কোন সমাজ যখন কোন বিদআত সৃষ্টি করে বা আমল করে তখন সেই সমাজ থেকে সমপরিমান সুন্নাত তুলে নেওয়া হয়। কাজেই কোন সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখা বিদআত সৃষ্টি করার চেয়ে উত্তম[১০০]।

উল্লেখ্য যে, আমলের মধ্যে সুন্নাত থাকা মানে রহমত থাকা আর সুন্নাত তুলে নেওয়া মানে রহমত তুলে নেওয়া। দুনিয়ায় সুন্নাত প্রতিষ্ঠার কারণেই মহানবী সা.কে ‘রাহমাতুল লিল আলামীন’ বলা হয়েছে। আর বিদআত ঢুকা মানে গযব নেমে আসা। কেননা বিভিন্ন হাদীসে বিদআতকে মহানবী সা. ‘লানত’ বলে অভিহিত করেছেন। একখানা হাদীসে বলা হয়েছে,

عن حسان رضى الله عنه قال ما ابتدع قوم بدعة الا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها اليهم الى يوم القيامة رواه الدارمى كذا فى مشكواة المصابيح

হযরত হাসসান রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেই সমাজ তাদের দীনদারী পালনের মধ্যে বিদআতকে স্থান দেয় সেই সমাজ থেকে মহান আল্লাহ ততটুকু পরিমাণ সুন্নাতকে সরিয়ে দেন। তারপর সেই সুন্নাতকে কিয়ামত পযন্ত তাদেরকে ফিরিয়ে দেন না[১০১]।

এ হাদীসও প্রমাণ করছে যে, বিদআত ও সুন্নাহ একটি অপরটির সম্পূর্ণ বিপরীত। তাছাড়া আরো বুঝা যাচেছ যে, মহান আল্লাহ নিজের পছন্দ জিনিসের সাথে মানুষের পছন্দ জিনিসকে মিলাতে নারাজ। বরং কেউ দীনচর্চায় গায়রুল্লাহর পছন্দকে গ্রহণ করলে আল্লাহ নিজ পছন্দের জিনিসটি সরিয়ে ফেলেন। আমলের ক্ষেত্রে এই সুক্ষ্ম শিরকও আল্লাহর অনুমোদন করেন না। আরো বড় কথা হল, বিদআতের প্রতিক্রিয়া এতই মন্দ যে, এর কারণে একবার সুন্নাতকে সরিয়ে নেওয়া হলে তা আর ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। কিয়ামত পর্যন্ত বিদআতীকে ততটুকু সুন্নাতের নিয়ামত থেকে চিরবঞ্চিত করে দেওয়া হয়। হযরত মোল্লা আলী কারী রা. বলেন, সুন্নাতের সমন্বয়ে গঠিত আমলের সংস্থাপন একটি বিশেষ বৈশিষ্টের অধিকারী। এই বৈশিষ্ট্য একবার কোন কারণে ক্ষুন্ন হয়ে গেলে তা আর কখনো পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে না। এমনকি ব্যক্তি যদি বিদআত থেকে তাওবা করে সুন্নাতে ফিরে আসে তখনও সেই বৈশিষ্ট্য ফিরে পায় না। হ্যাঁ, তাওবার কারণে গুনাহ মাফ হবে এবং ফিরে আসার কারণে সুন্নাতের সওয়াব পাবে কিন্তু পূর্বের সেই বৈশিষ্ট্য থাকবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কোন চারাগাছ যদি মাটি থেকে উপড়িয়ে ফেলা হয় তাহলে চারাটি মারা যাবে। যদি আবার এটিকে মাটিতে রোপন করা হয় তাহলে বাঁচবে কিন্তু পূর্বে চারার শিকড়গুলো ভূমিতে যেভাবে স্থাপিত

---

১০০. ইমাম আহমদ, সুত্র ঃ মিশকাত, পৃ. ৩১।
১০১. ইমাম দারেমী, আস সুনান, সূত্র ঃ মিশকাত, পৃ. ৩১।

ছিল এবং চারাটি যেই খাস বৈশিষ্টের মধ্যে ছিল সেটি ফেরত আসবে না। এর শিকড়গুলো ঠিক সেভাবে আবার ভূমিতে স্থাপিত হবে না। আর স্থাপিত হলেও তা হবে তবে অন্যভাবে।

বিদআত প্রতিরোধের চেতনা ঈমানের লক্ষণ

বিদআত সুন্নাতের সংহারক ও ক্রমান্বয়ে ঈমানের বিনাশ সাধনকারী। এই বিদআতকে সে ঈমানদার ব্যক্তি সমর্থন করতে পারে না যে আলাহ্ জালা শানুহু ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে, তাঁর সুন্নাতকে পছন্দ করে ও ঈমানের উপর অবিচল থাকতে চায়। হ্যাঁ, যারা বিদআতের হাকীকত জানে না তাদের কথা ভিন্ন। ঈমানদার যিনি নিজ ঈমানের উপর অবিচল থাকতে চান তিনি কখনো বিদআত সমর্থন তো করবেনই না বরং বিদআতকে প্রতিরোধ করতে তাকে তাঁর ঈমান বাধ্য করবে। উল্লেখ্য দিলের ভিতর বিদআত প্রতিরোধের এই চেতনা বিদ্যমান থাকা ঈমানের লক্ষণ। কোন কারণে দিল থেকে যদি এই চেতনা বিলুপ্ত হয়ে গেল তাহলে বান্দার নসীবে হালাকত ছাড়া অন্য কিছু নেই। একখানা হাদীসে প্রিয়নবী সা. স্পষ্ট ইরশাদ করেছেন,

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبى بعثه الله فى امته الا كان له فى امته حواريون واصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذالك من الايمان حبة خردل رواه مسلم كذا فى مشكواة المصابيح

হযরত আবদুলাহ্ ইবন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ জাল্লাহ শানুহু আমার পূর্বে যেই নবীকেই নিজ উম্মতের মধ্যে প্রেরণ করেছেন তাঁর সঙ্গে ছিল এমন কিছু সহচর ও সাহাবী যাঁরা সেই নবীর সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে পালন করেছে এবং নবীর নির্দেশ মান্য করেছে। তারপর তাঁদের চলে যাওয়ার পর তাঁদের উত্তরাধিকারী হয়েছে এমন অযোগ্যরা যারা এমন কথা বলে যা আমল করে না, আবার এমন আমল করে বা তাদের আদিষ্ট করা হয়নি। অতএব পরবর্তী কালীন উপরোক্ত গুমরাহদের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি সশস্ত্র জিহাদ করবে সে প্রকৃত মমিন, যে মুখ দ্বারা জিহাদ করবে সে প্রকৃত মুমিন, যে হৃদয় দ্বারা জিহাদ করবে সেই প্রকৃত মুমিন। বর্ণিত তিন পর্যায়ের বাইরে ঈমানের কোন স্থান নেই[১০২]।

এই হাদীস বুঝাচেছ যে, পূর্ববর্তী যামানায়ও উম্মতের যে সব লোক বিদআতের পথে চলেছে তারা পরিমাণে ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে যারা বিদআতের প্রতিরোধে হাত দিয়ে যুদ্ধ করেছে কিংবা মুখ দিয়ে যুদ্ধ করেছে কিংবা অন্তর দিয়ে যুদ্ধ করেছে তারা ঈমানের উপর অটল থাকতে সক্ষম হয়েছে।

গর্হিত কাজকে শতীঅতের পরিভাষায় মুনকার বলে। বিদআত হল জঘন্যতম মুনকার। এহেন মুনকার সম্পর্কে উম্মতের করণীয় হল দেখা মাত্রই সেটির প্রতিরোধ করা। গর্হিত কাজ দেখে মনে মনে অন্ত ত দুঃখিত হওয়া জরুরী। নতুবা অন্তর থেকে ঈমানের নূর চলে যায়। যেই ঈমানদারের দিলে বিদআত দেখেও দুঃখ আসে না কিংবা প্রতিবিধানের ইচ্ছা জাগে না কিংবা জানা সত্তেও বিদআত করতে ভাল লাগে তার পরিনাম বড় বয়াবহ। হাদীসে আছে,

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذالك اضعف الايمان رواه مسلم كذا فى مشكواة المصابيح

১০২. ইমাম মুসলিম, সুত্র ঃ মিশকাত, পৃ. ২৯।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ শরীঅত বিরোধী কোন কাজ দেখলে তার উচিৎ কাজটি হাত দিয়ে প্রতিবিধান করা। যদি তাতে সক্ষম না হয় তাহলে মুখ দিয়ে প্রতিবিধান করবে। যদি তাতেও সক্ষম না হয় তাহলে অন্তত মনে মনে ভাববে যে, কি করে প্রতিবিধান করা যায়। এটি হল ঈমানের দুর্বলতম স্তর। এই স্তরের নীচে ঈমানের কোন স্তর নেই[১০৩]।

বিদআত তথা মুনকার জিনিস প্রতিরোধের এই চেতনা যদি ধরে রাখা না হয় কিংবা কোন কারণে বিলম্ব হয়ে যায় তাহলে ভাগ্যে শুধু বেঈমানীই নয় মহানবীর ভাষায় মহান আল্লাহ সেই সমাজ থেকে পারম্পরিক শান্তি ও সম্প্রীতি তুলে নেন। তাদেরকে ভয়াবহ অন্তর্দ্বন্ধ, ঝগড়া বিবাদ, কলহ, গৃহযুদ্ধ ও নানাবিদ অভিশপ্ত কাজে নিক্ষিপ্ত করে দেন। ইরশাদ হচেছ,

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدى الظالم ولتأطرنه على الحق اطرا ولتقصرنه على الحق قصرا او ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم   كذا فى مشكواة المصابيح

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, মনে রেখ, এখানে অন্যথার কোন সুযোগ নেই, আল্লাহর কসম! তোমরা অবশ্যই ভাল কাজের আদেশ করবে। অবশ্যই মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে। অবশ্যই জালিমের হাত চেপে ধরে জুলুম বন্ধ করবে। অবশ্যই তাকে অন্যায় থেকে সরে ন্যায়পথে আসতে বাধ্য করবে। অবশ্যই তাকে ন্যায়ের সীমানায় সীমাবদ্ধ করে ফেলবে। আর যদি না কর তাহলে আল্লাহ জাল্লা শানুহু তোমাদের অন্তরগুলোর একটিকে অপরটির উপর কঠিন ভাবে লেলিয়ে দিবেন। তারপর এমন ভয়াবহ অন্তদ্বন্ধের উদ্রেক করে তোমাদের লানতগ্রস্থ করবেন যেভাবে তিনি ইতোপূর্বে বনী ইসরাঈলকে লানতগ্রস্থ করেছিলেন[১০৪]।

বিদআত থেকে সাবধানতার কারণেই আবিদের চেয়ে আলিমের সম্মান বেশী

যে মুসলমান ইবাদত করে অথচ তার সেই ইবাদত রাসূলুলাহ সা.-এর সুন্নাতের সাথে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ তা জানে না তাকে বলা হয় 'আবিদ'। আর যিনি ইবাদতের সাথে সাথে এ কথাও জানেন যে, তার সম্পাদিত ইবাদত ও নেক আমল রাসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাতের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ, রাসূলুল্লাহ সা.-এর জীবন থেকে নিশ্চিত সূত্রে জেনে তিনি সে মোতাবেক নিজের আমল ও ইবাদতকে সাজিয়ে সম্পাদন করছেন তাকে বলা হয় আলিম। আলিম ও আবিদ উভয় ইবাদত করেন। কিন্তু উভয়ের ইবাদত ও মর্যাদায় রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। আবিদের চেয়ে আলিমের ইবাদত ৭০ (সত্তর) স্তর বা গুণ বেশী মর্যাদা সম্পন্ন। উল্লেখ্য আমলটি বিদআত কি সুন্নাত সেই সাবধানতা অবলম্বনের কারণেই আবিদের চেয়ে আলিমের দাম এত বেশী হয়ে গিয়েছে। হাদীসে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বলা আছে। ইরশাদ হচেছ,

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد سبعون درجة بين كل درجتين حضر الغرس سبعون عاما وذالك لان الشيطان يبدع البدعة فيصبرها العالم فينهى عنها والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا يعرفها رواه الاصفهانى كذا فى الترغيب والترهيب

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, আলিমের সম্মান আবিদের তুলনায় সত্তর স্তর বেশী। এই স্তরগুলোর মধ্যে প্রতি দুই স্তরের ব্যবধান হল সত্তর বছর পর্যন্ত ঘোড়া দৌড়িয়ে যতটুকু পথ অতিক্রম করা যায় ততটুকু। এই ব্যবধানের

১০৩. ইমাম মুসলিম, সূত্র ঃ মিশকাত, পৃ. ৪৩৬।
১০৪. মিশকাত, পৃ, ৪৩৮।

মূলকারণ হল বিদআত থেকে সাবধানতার অবলম্বন। কেননা শয়তান (প্রতিনিয়ত) বিদআত সৃষ্টি করছে। এমতাবস্থায় যিনি আলিম তিনি তা চিনতে পারেন এবং নিজকে বিদআত থেকে বাঁচিয়ে সুন্নাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন। পক্ষান্তরে যিনি শুধু আবিদ তার জন্য সেই সুযোগ হয় না। তিনি তো ইবাদতেই মগ্ন থাকেন। বিদআত তার ইবাদতকে কলুষিত করছে কি না তা টেরও করতে পারেন না[১০৫]।

প্রকৃত আলিম সেই ব্যক্তি যিনি বিদআত সম্পর্কে সচেতন থাকেন, যিনি নিজে সেই অনুসারে আমল করেন ও অন্যদের আমলের শিক্ষা দেন। কোন আবিদের চেয়ে এই আলিমের সম্মান অনেক বেশী। কত বেশী সে সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসে সত্তর স্তরের কথা বলা হয়েছে। অন্য হাদীসে এটি আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ বলা আছে। ইরশাদ হচ্ছে,

عن ابى امامة الباهلى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلى على ادناكم ثم قال ان الله وملئكته واهل السموات والارض حتى النملة فى حجرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذى كذا فى مشكواة المصابيح

হযরত আবূ উসামা বাহিলী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মাধ্যকার অতি সাধারণ লোকটির তুলনায় আমার সম্মান যতখানি বেশী একজন আবিদের তুলনায় একজন আলিমের সম্মান ততখানি বেশী। তারপর বললেন, যেই আলিম মানুষকে কল্যাণ তথা সুন্নাতের শিক্ষা দেয় তার জন্য মহান আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, আসমান-যমীনে অবস্থিত তাঁর সকল মাখলূক এমনকি গর্তের ভিতরে অবস্থিত পিপড়া, পানিতে অবস্থিত মাছ পর্যন্ত দুআ করে[১০৬]।

উপরোক্ত হাদীসদ্বয় থেকে বুঝা যায় বিদআতের বিষয়ে সচেতনতা ব্যক্তির ইবাদতকে বহুগুণে দামী বানিয়ে দেয়। তাছাড়া বিদআত দূর করে সুন্নাতের আমল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা মানুষকে শিক্ষা দেন তাঁদের জন্য জগতের ছোট বড় সকল মাখলূক দুআ করে থাকে। মাখলূকের এই দুআ করার হিকমত বর্ণনা করে হযরত মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন, দীন ও সুন্নাহর উপস্থিতিই দুনিয়াকে টিকিয়ে রাখে। সুন্নাত সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়ে গেলে দুনিয়া দুনিয়া থাকবে না। কিয়ামত হয়ে যাবে। তাই যারা সুন্নাতের তালীম দিচেছন তাঁরা প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথিবী ও পৃথিবীর সকল ব্যবস্থাপনা ঠিক থাকতে শক্তি ও উপকরণ যোগাচেছন। পৃথিবী ঠিক আছে বলেই পৃথিবীতে অবস্থিত প্রাণীকূল বেঁচে আছে। বিষয়টি গভীণভাবে হৃদয়ঙ্গম করছে বলেই জীবজন্তু এমনকি সকল মখলূক তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য দুআ করছে। পবিত্র কুরআনে মহান আলাহ এদিকে ইশারা করেই ইরশাদ করেন,

قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولوا الالباب

বল, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান ? বোধ শক্তি সম্পন্ন লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে[১০৭]।

সুন্নাত মোতাবেক সামান্য আমল বিদআতের অজস্র আমল থেকে উত্তম

নেক আমল সম্পাদনের ক্ষেত্রে ইসলাম সংখ্যাধিক্যের তুলনায় মানসম্পন্নতাকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। সুন্নাতের বরখেলাফ হিমালয় পাহাড় পরিমান আমলের চেয়ে সুন্নাত মোতাবেক ষরিষা দানা পরিমাণ আমল অনেক উত্তম। কিয়ামতের দিন কেউ আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত ভর্তি আমল নিয়ে হাজির হবে। তার আমল দেখে কিয়ামতের গোটা ময়দান অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু ফলাফল হবে এমন যে, এ আমলগুলো সুন্নাত মোতাবেক হয়নি বলে আল্লাহর কাছে কোন মূল্যই পাবে না। অথচ অন্য একজন সুন্নাত

১০৫. ইমাম ইসফাহানী, সূত্র ঃ আত তারগীব ওয়াত তারহীব, হাদীস নং- ১৩৫।
১০৬. ইমাম তিরমিযী, সূত্র ঃ মিশকাত, ---------।
১০৭. সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৯।

মোতাবেক সামান্য মিসওয়াক করার সওয়াব নিয়ে হাজির হবে আর সেই সওয়াব দ্বারা সে নাজাত পেয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সা. ও তাঁর সাহাবীগণ যে নফল ইবাদত খুব বেশী করতেন তা নয়। তাঁরা মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সাধারণ পরিমাণ নেক আমল করতেন। আর যা করতেন সম্পূর্ণ নিখুঁত করতেন। পরিমাণের চেয়ে আমলটি নিখুঁতভাবে করার দিকেই তাঁদের মনোযোগিতা বেশী ছিল। এটিই ইসলামের মূল প্রকৃতি। একখানা হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. বলেও দিয়েছেন যে, তোমরা আমলকে নিখুঁত বানাও। তাহলে স্বল্প আমলই নাজাত প্রাপ্তির জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে[১০৮]।

বিদআতের মিশ্রণ যে কোন আমলের পবিত্রতা নষ্ট করে দেয়, আমলটি দুষিত বানিয়ে ফেলে। নেক আমলের মধ্যে কোন বিদআতের মিশ্রণ থাকলে সেই নেক আমল আসমান পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। হাদীসে আছে,

عن عبد الله ابن مسعود رضى الله عنه قال الاقتصاد فى السنة احسن من الاجتهاد فى البدعة رواه الحاكم

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুন্নাত মোতাবেক সম্পাদিত সাধারণ পর্যায়ের আমল বিদআত পর্যায়ের কষ্টকর আমল থেকেও উত্তম[১০৯]।

উল্লেখ্য কোন আমল নিখুত ও মানসম্পন্না হওয়ার মানদণ্ড কি ? এ ব্যাপারে আলিমগণের সকলে একমত যে, মানদণ্ড হল সুন্নাত। সুন্নাতের সঙ্গে একশ ভাগ সামঞ্জস্য রাখলে একশ ভাগ নিখুঁত, পঞ্চাশ ভাগ সামঞ্জস্য রাখলে পঞ্চাশ ভাগ নিখুঁত বিবেচিত হবে। অনুরূপে যে নেক আমল সুন্নাহর সঙ্গে মিলে না- সেটি আর যাই হোক আল্লাহর কাছে গৃহীত নেক আমল নয়। সায়্যিদুনা হযরত আলী রা. এক জায়গায় বিষয়টি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। ইরশাদ হচেছ,

عن على رضى الله عنه قال لا تتبعون شيئا افضل من سنة نبيكم رواه احمد

হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, অনুসরণ করার জন্য তোমরা তোমাদের নবী সা. থেকে প্রাপ্ত সুন্নাতের চেয়ে ভাল জিনিস অপর কিছু পাবে না[১১০]।

তাসাউফ জগতের মহান সম্রাট, জগত জুড়ে প্রতিষ্ঠিত পীরমুরীদীর সকল সিলসিলার যিনি মূলভিত্তি, বিশিষ্ট তাবিয়ী হযরত হাসান বসরী রহ. বিদআতের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। মহানবী সা. এর সুন্নাতের বাইরে এক চুল পরিমান জিনিসও তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর মতেও যে কোন আমল গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হওয়ার মানদণ্ড হল সুন্নাত। সুন্নাত অনুসারে সম্পাদিত নেক আমল তা পরিমাণে অল্প হলেও দাম অনেক বেশী। তাঁরই বর্ণিত একখানা হাদীস নিরূপ ;

عن الحسن البصرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليل فى سنة خير من عمل كثير فى بدعة ومن استن بى فهو منى ومن رغب عن سنتى فليس منى رواه عبد الرزاق فى مصنفه

হযরত হাসান বাসরী রাহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, সুন্নাতের মধ্যে সম্পাদিত স্বল্প আমল বিদআতের মধ্যে সম্পাদিত প্রচুর আমল অপেক্ষা উত্তম। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অনুসরণ করবে সে আমার উম্মত। আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত অপছন্দ করবে সে আমার উম্মত নয়[১১১]।

---

১০৮. كما قال عليه الصلاة والسلام اخلص دينك يكفيك العمل القليل

মুসতাদরাকে হাকিম, খ. ৪, পৃ. ৩০৬; মুনযিরী, হাদীস-৪।

১০৯. ইমাম হাকিম, খ. ২, পৃ. ১০৩।

১১০. ইমাম আহমদ, প্রাগুক্ত নং-৯৮২।

১১১. ইমাম আবদুর রাযযাক সানআনী, আল মুসান্নাফ, ১১/২৯১, হাদীস ২০৫৬৮; হাসান বসরী পর্যনত হাদীসটির সনদ মুরসালরূপে সহীহ। এছাড়া অন্যান্য সনদের আলোকে মুত্তাসিল হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে। দ্র. ইমাম শাতিবী, আল ইতিসাম, খ. ১, পৃ. ১০৮।

লোকে কি করে সেদিকে কান দিও না, আত্মরক্ষার চিন্তা কর

বিদআতের পক্ষে শয়তান মানুষকে যে দলীলটি বেশী সরবরাহ করে এবং যেটির দ্বারা সে অতি সহজে কাউকে সম্মত করিয়ে ফেলে তা হল 'লোকেরা করে' এ রেফারেন্স উত্থাপন। উল্লেখ্য শরীঅতের দৃষ্টিতে লোকেরা কোন কাজ করলেই তা ভাল বা গ্রহণযোগ্য হয়ে যায় না। গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কাজটির সপক্ষে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর সমর্থন থাকা আবশ্যক। যা সত্য তা সত্যই। পৃথিবীর সকল লোক যদি তা মন্দ মনে করে কিংবা তার বিপরীত কাজ করে তুবও সত্য সত্যই থাকবে। সত্য মিথ্যায় পরিণত হবে না। অনুরূপে যা মিথ্যা তা মিথ্যাই। জগতের সকল লোক সেটিকে আমল করলে বা সত্য বললে তা সত্য হবে যাবে না। তদ্রুপ বিদআত বিদআতই। জগতের সকল লোক যদি বিদআতকে দীন বা শরীঅত মনে করে তাহলে তাদের এই মনে করার কারণে বিদআত সুন্নাতে পরিণত হবে না। হ্যাঁ, যারা লোকের কাজ দেখে বিদআতকে সুন্নাত জ্ঞান করেবে তারা নিজ মর্যাদা থেকে ছিটকে পড়ে যাবে। পক্ষান্তরে যা সুন্নাত পৃথিবীর কেউ যদি তা না মানে বা তা অনুসারে আমল না করে তাহলে এই সুন্নাতের গুরূত্ব বিন্দুমাত্র হ্রাস পাবে না। একটি লোকও যদি সুন্নাতের উপর আমল করে সে আল্লাহর কাছে দামী বিবেচিত হবে। উল্লেখ্য এ কারণেই শরীঅতে লোকেরা কি করে বা কোন কাজে তাদের মনঃসন্তুষ্টি সেদিকে তাকানোর অনুমতি দেয়নি। পক্ষান্তরে লোকের ধ্যান-ধারণা পেছনে ফেলে রেখে কি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সন্তুষ্ট হন এবং কি কাজ করলে আমি নিজে কবরে গিয়ে রক্ষা পাবো সেটি বিবেচনার জন্য শরীঅত বারবার তাকিদ করেছে।

গবেষক আলিমগণ বলেছেন, সাধারণ মানুষের জন্য দলীল হল আলিম উলামা। তারা আলিম-উলামাকে দেখে শরীঅত শিখবে ও আমল করবে। আর আলিম উলামার জন্য দলীল হল পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ। তাঁরা পবিত্র কুরআন ও সুন্নার আলোকে নিজেদের সাজাবে ও মানুষকে জ্ঞান দান করবে। এটা্ই হল হিদায়াতের নীতি। আর যদি এর বিপরীত হয় তাহলে গুমরাহী সুনিশ্চিত। অর্থাৎ সাধারণ মুসলমান যারা আলিম নয়, তারা যদি আলিম না হওয়া সত্তেও পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সরাসরি দীন গ্রহণ শুরু করে এবং আলিমদের অনুসরণ বাদ দেয় কিংবা আলিম উলামা যদি লোকের মনঃসন্তুষ্টির অনুসরণ শুরু করে আর কুরআন সুন্নাহ বাদ দেয় তাহলে উভয় দলের জন্যই নিশ্চিত গুমরাহী।

একটা পর্যায় আছে যখন নিজের ঈমান ও আমল রক্ষার্থে লোকালয় থেকে প্রয়োজনে পলায়ন করে থাকতেও শরীঅত হুকম দিয়েছে। লোকের মধ্যে যখন আমর বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকার-এর আমল ফল দিবে না বরং লোকজন নিজেরা মূর্খ হয়েও শরীঅতের কাজে কর্তৃত্ব শুরু করে তখন এভাবে সমাজ থেকে দূরে থাকার মধ্যে নিরাপত্তা। কেননা সমাজের হাল কখনো কখনো এমন হয়ে যায় যে, সাধারণ মানুষ না বুঝে বিদআতের পক্ষে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে যায়। সুন্নাত কাকে বলে কিংবা বিদআত কাকে বলে এগুলোর হাকীকত কি, এ সম্পর্কে যাদের আদৌ ধারনা নেই তারাই কিনা বিদআতের পক্ষে এমন দলভারী করে যে বিদআতকে প্রতিষ্ঠা করার রীতিমত সংগ্রামে নেমে যায়। তারা এমন স্রোতের সৃষ্টি করে যে সেই স্রোত হক ও হক্কানিয়্যাতের সকল আয়োজন ভাসিয়ে নিয়ে চলে। যিম্মাদার হক্কানী আলিম উলামার জন্য এ মূহুর্তগুলো সবচেয়ে কঠিন হয়। এ সকল পরিস্থিতিতে শরীঅতের নির্দেশ হল, তখন সাধারণ মুর্খদের মন্দ পরিণতির কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিজের ঈমান ও আমল বাঁচাও তথা সুন্নাতের উপর বলবৎ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা কর। হাদীসে ইরশাদ হচেছ,

عن ابى ثعلبة رضى الله عنه فى قوله تعالى عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم فقال اما والله لقد سألت عنها رسول الله فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذى راى برائه ورأيت امرا لا بد لك منه فعليك نفسك ودع امر العوام فان ورائكم ايام الصبر فمن صبر فيهن قبض على الجمر الخ رواه الترمذى كذا فى مشكواة المصابيح

হযরত আবূ সালাবা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তাকে নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। আয়াতটি হল,

يايها الذين أمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون

হে মুমিনগণ! তোমাদের দায়িত্ব তোমাদেরই উপর। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তিনি তোমরা যা করতে সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অভিহিত করবেন[১১২]।

তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আয়াতটির ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমিও রাসূলুল্লাহ সা.কে জিজ্ঞাসা করে ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সা. বলে ছিলেন, বরং তোমরা সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজের বাধাদান অব্যাহত রাখ। অবশেষে তুমি যখন দেখবে যে, (তোমার উপদেশ শোনা হচ্ছে না) কৃপণতা লোকের স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছে এবং কৃপণতাকে অনুসরণ করা হচেছ, সবাই নাফসের খাহেশ পুরণ করছে, দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিচেছ, প্রত্যেক নিজ রায় ও অভিমতের উপর চলছে আর তুমিও দেখতে পাচেছা যে, নিজে বেঁচে থাকার জন্যও কোন পথ নেই, এমতাবস্থায়, তোমার জন্য পরামর্শ হল, তুমি লোকের চিন্তা বাদ দাও ও আত্মরক্ষার চেষ্টা কর। সম্মুখে আরো এমন সময় আসবে যখন সবর ব্যতীত কোন পথ থাকবে না। আর সবরকারীর অবস্থাও হবে হাতের (তালুতে) জলন্ত অঙ্গার ধারণকারীর ন্যায়[১১৩]।

বিদআত ও বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ার যুগে সুন্নাতকে ধরে রেখে আত্মরক্ষার নববী পয়গাম সম্পর্কে আরো অন্যান্য হাদীসেও নির্দেশ পাওয়া যায়। একখানা হাদীস যেমন,

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال كيف اذا بقيت فى حثالة من الناس مرجت عهودهم وامانتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين اصابعه قال فبم تأمرنى قال عليك بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصة نفسك واياك وعوامهم وفى رواية الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بامر خاصة نفسك ودع امر العامة رواه الترمذى كذا فى مشكواة المصابيح

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মহানবী সা. তাকে বললেন, সে সময় তোমাদের কি অবস্থা দাঁড়াবে যখন তোমরা এমন লোকজনের মধ্যে বাস করবে যারা মানুষ নয়, মানুষের পোশাকধারী মাত্র। যাদের বিশ্বস্থতা ও আমানতদারী বিনষ্ট হয়ে যাবে। যারা পরস্পর মতভেধে পতিত হয়ে থাকবে। কথাটি বলে মহানবী নিজ হস্তদ্বয়ের আঙ্গুল মিলিয়েও দেখালেন। হযরত আবদুল্লাহ বলেন, আমি বললাম, (ইয়া রাসূলালাহ!) সে মুহূর্তে বাঁচার জন্য আপনি আমাকে কি পরামর্শ দিচেছন? মহানবী সা. বললেন, সেই মুহূর্তে তুমি যে কাজ শরীঅত ও সুন্নাহ মোতাবেক দেখবে সেটির অবলম্বন করবে। আর যা শরীঅতের খেলাফ দেখবে তা পরিত্যাগ করবে। তখন তুমি নিজের আত্মরক্ষার চিন্তা করবে এবং লোকের চিন্তা বাদ দিবে। অপর বর্ণনায় আছে, তখন তুমি নিজ গৃহে বেশী অবস্থান করবে, (বাইরে যাতায়াত বেশী করবে না) নিজের জিব্বা ও কথাবার্তা নিয়ন্ত্রিত রাখবে, শরীঅত সম্মত জিনিস গ্রহণ করবে, শরীঅতের খেলাফ জিনিস বাদ দিবে। তুমি বিশেষতঃ নিজকে বাঁচানোর চেষ্টায় থাকবে এবং লোকের চিন্তা পরিত্যাগ করবে[১১৪]।

---

১১২. সূরা মায়িদা, ৫ ঃ ১০৫।

১১৩. ইমাম তিরমিযী ও ইবন মাজা, সূত্র ঃ মিশকাত পৃ. ৪৩৭।

১১৪. ইমাম তিরমিযী, মিশকাত, পৃ. ৪৬৩।

قال القارى قوله رأيت امرا لا بد منه اى لا فراق لك منه والمعنى رأيت امرا يميل اليك هواك ونفسك من الصفات الذميمة حتى اذا قمت بين الناس لا محالة ان تقع فيها فعليك نفسك واعتزل عن الناس حذرا مت الوقوع او المعنى فان رأيت امرا لا طاقة لك عن دفعه فعليك نفسك وقوله دع امر العوام اى اترك امر عامة الناس الخارجين عن طريق الخواص وحاصله انه اذا رأيت بعض الناس يعملون المعاصى ولا بد لك من السكوت لعجزك فاحفظ نفسك عن المعاصى واترك الامر بالمعروف والنهى عن المنكر واشتغل بنفسك ودع امر الناس الى الله عز وجل

বিদআত দেখতে সুন্দর ভিতরে অন্ধকার

বিদআত ও সুন্নাতের একটা অতি সাধারণ পার্থক্য হল যে, বিদআত দেখতে খুবই সুন্দর, আকর্ষণীয় ও মনোজ্ঞ হবে। সুন্নাতের মধ্যে এ রকম বাহ্য আকর্ষণ নেই। বিদআতের মধ্যে বাহ্যিক এই সৌন্দর্য থাকলেও ভিতরে অন্ধকার। এটি মাকাল ফলের মত। চামড়া খুবই আকর্ষণীয় কিন্তু ভিতরের জিনিস আদৌ আহার যোগ্য নয়। একখানা হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, জান্নাত যা সর্বময় সুখের স্থান তার বহিরাবরণ মহান আল্লাহ এমন জিনিস দ্বারা তৈরী করেছেন যা দেখে কেউ সেদিকে অগ্রসর হতে চাইবে না। আবার জাহান্নাম যা সর্বময় কষ্টের স্থান- তার বহিরাবরণ এমন জিনিস দ্বারা তৈরী করেছেন যেখানে সবাই ছুটে যেতে আকাংখা করবে। জান্নাত জাহান্নামের এই প্রকৃতি এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট আমলের মধ্যেও বিদ্যমান। জান্নাতের আমলে বাহ্যিক আকর্ষণ কম ও দেখতে কষ্টকর। কিন্তু জাহান্নামের আমলে বাহ্যিক আকর্ষণ বেশী ও দেখতে সুন্দর। বিদআতের পরিণতি জাহান্নাম বিধায় বিদআত কর্মের বহিরাবরণও সুন্দর ও আকষর্ণীয় হবে। যদিও এ আকর্ষণের আড়ালে লুকিয়ে আছে অজস্র অন্ধকার।

কোন নেক আমল তখনই নেক আমল রূপে সাব্যস্ত হয় যখন তা সম্পাদন করা হয় আলাহ্‌ জালা-শানুহুর হুকুম ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর তরীকা অনুসারে। পক্ষান্তরে কেউ যদি কোন নেক আমল দেখতে ভাল দেখা যায় বিধায় সম্পাদন করে কিংবা তার কাছে ভাল লাগে বিধায় সম্পাদন করে তাহলে সেটি প্রকৃত প্রস্তাবে নেক আমলই হয় না। সেটি হয় সুন্দরের পুজা কিংবা নিজ মনের ভাল লাগার পুজা। সেটি আল্লাহর ইবাদত কিংবা আল্লাহর জন্য সম্পাদিত নেক আমল নয়।

বিদআতের বাহ্যিক এ আকর্ষণ যেন কাউকে প্রতারিত করতে না পারে সেজন্য সাহাবী যুগ থেকেই হক্কানী আলিমগণ মানুষকে কঠোর ভাষায় সাবধান করে আসছেন। সাহাবায়ে কিরাম এক্ষেত্রে স্পষ্টই বলে দিতেন যেমন,

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه انه قال كل بدعة ضلالة وان راها الناس حسنة رواه ابن بتاه فى الابانة

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবন উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সব বিদআতই গুমরাহ্‌ যদিও লোকে এটিকে দেখে খুব সুন্দর[১১৫]।

বিদআতের ভিতরে যে অন্ধকার এবং তাতে যে কোন নূর নেই তা চক্ষুষ্মান অভিজ্ঞ সুফী পীর বুযর্গগণও বলে গিয়েছেন। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী রহ. স্পষ্ট দাবী করে বলেছেন যে, বিদআতের মধ্যে কোন নূর নেই, আছে অন্ধকার আর অন্ধকার। এটির সাহায্যে রূহানিয়্যতের উন্নতি ঘটে না, ঘটে অবনতি। এটি রূহানী ইসলাহের ঔষধ তো নয়ই, বরং স্বয়ং রোগ। এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন,

সর্বশ্রেষ্ঠ নসীহত হল রাসূলুল্লাহ সা.-এর দীন মনে চলা, তার সুন্নাত আদায় করা ও বিদআত থেকে বেঁচে থাকা। বিদআত যদি বাহ্যত প্রভাতের নির্মল আলোর চেয়েও উজ্জল দেখা যায় তবুও সেটি নূর থেকে বঞ্চিত। তাতে রূহানী কোন রোগের ঔষধ নেই। কেননা এটি দুই অবস্থার কোন একটি থেকে মুক্ত নয়, হয়ত কোন সুন্নাতকে উৎখাত করে দেয়, নয়ত কোন সুন্নাতকে নিস্তেজ করে ফেলে[১১৬]।

বিদআত পালনে শয়তান খুশি হয়

সুন্নাতের উপর আমলের শেষফল হল সামগ্রিক হিদায়েত লাভ। তাই সুন্নাত পালনে খুশি হন আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল। আর বিদআতের শেষফল হল গুমরাহী। তাই বিদআত পালনে খুশি হয় নফস ও শয়তান। অনুরূপভাবে বিপরীত দিক থেকেও বিবেচনা করুন। কারো সুন্নাত পালন দেখলে শয়তান নাখোশ হয় যেভাবে কারো বিদআত পালন দেখে আল্লাহ ও আলাহ্‌র রাসূল নাখোশ হন। মুসলমান এখন নিজেরা ফয়সালা করবে যে, সে কাকে খোশ রাখবে আর কাকে বেজার করবে। কেউ যদি জেনে বুঝেও বিদআত

১১৫. ইবন বাত্তাহ, আল ইবানা, ২/১১২/২, লালকারী শরহু উসূলি আইলিম সুন্নাহ, নং ১২৬, আলবানী, আহকামুল জানায়িয, পৃ. ২০০-২০০২।

১১৬. মাকতূবাত, খ.২, ১ম ভাগ, মাকতূব নং-১৯, পৃ. ৬৩।

করে এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে নাখোশ বানিয়ে শয়তানকে খুশি রাখতে চায়- সেটা তার ব্যাপার। কিন্তু এতটুকু নিশ্চিত যে, বিদআতে প্রতি অসন্তুষ্টি ও বিদআত পরিত্যাগ করা ব্যতীত মহান আলাহ্‌ ও আলাহ্‌র রাসূল সা.কে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়।

প্রত্যেক কাজের একটা বিশেষ প্রভাব আছে। এ প্রভাব সুন্নাতের ক্ষেত্রে যেমন পাওয়া যায় তেমনি বিদআতের ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়। সুন্নাত পালনের দ্বারা মানুষের দিল ও কলব তাজা হয়। দিলে রূহানী শক্তি বৃদ্ধি পায়। আমলের শওক ও যজবা বাড়ে। দুনিয়ার মোহ আকর্ষণ কমে যায়। কবর, আখিরাত ও আলাহ্‌ জালা- শানুহুর দীদারের প্রতি মায়া বাড়ে। পক্ষান্তরে বিদআত পালনের দ্বারা মানুষের নফস তাজা হয়। দিল থেকে রূহানী শক্তি খর্ব হতে থাকে। সহীহ আমলের জযবা হ্রাস পায়। দুনিয়ার মোহ বাড়ে। কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ তো নয়ই খালিস ইবাদত নামায রোযাও জাগতিক মোহ পূরণের উপকরণে পরিণত হয়ে যায়। বিদআতের রূহানী ক্ষতিকারক এ দিকটি নির্দেশ করে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী বলেন যে, কোন বিদআতকারী কখনো প্রকৃত রূহানিয়্যত অর্জন করতে পারে না।

বিদআত শয়তানের অস্ত্র। এই অস্ত্র দ্বারা শয়তান পয়গাম্বরগণের উপর প্রতিশোধ নিয়ে থাকে। যুগে যুগে শয়তান বনী আদমকে গুমরাহ করার চেষ্টা করে আসছে। শয়তানের বানানো গুমরাহীর রাজ্যকে যুগে যুগে পয়গাম্বরগণ ভেঙ্গে দিয়ে আসছেন। তাঁরা শয়তানের সেই রাজ্যে তাওহীদ ও সুন্নাতের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করে আসছেন। তাতেই কিনা শয়তান পয়গাম্বরগণের উপর ভীষণ নাখোশ। পয়গাম্বরগণের মধ্যেও বেশী নাখোশ হল আখেরী পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সা. এর উপর। কারণ সায়্যিদুল মুরসালীন সা. শয়তানের নির্মিত শিরক কুফরকে শুধু দমনই নয়- বিদআতের বিষবৃক্ষকে আরব বদ্বীপ থেকে সমূলে উৎখাত করে দেন। তিনি শয়তানের প্রতিষ্ঠা করা শিরক ও কুফরের কোমর এমনভাবে ভেঙ্গে দেন যা সোজা করা শয়তানের পক্ষে সুকঠিন হচেছ। তাছাড়া ঈমান ও আমলের চতুর্দিকে সুন্নাতের প্রাচীর প্রতিষ্ঠা করে তাওহীদকে এমন কঠিনভাবে সংরক্ষিত করেন যা ইতপূর্বে কোন নবী করে যেতে পারেননি। এ সব কারণে শয়তান শেষ নবী সা.-এর উপর বেশী নাখোশ। তবে শয়তানের কাছে শান্তনার একটি জিনিস আছে সেটি তার দীর্ঘকালীন হায়াত। পয়গাম্বরগণের কেউ বেঁচে নেই। বেঁচে থাকার কথাও নয়। কেননা তাঁরা কেউ কিয়ামত পর্যন্ত লম্বিত হায়াত পাননি। কিন্তু শয়তান মহান আল্লাহর কাছ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকার হায়াত নিয়ে এসেছে। সে বেঁচে আছে- প্রতিপক্ষ বেঁচে নাই। সে কিয়ামত পর্যন্ত বেছে থাকবে প্রতিপক্ষ কিয়ামত পর্যন্ত বেচে থাকবে না। তাই তার জন্য এখানে অনেক কিছু করতে সুযোগ আছে- প্রতিপক্ষের সেই সুযোগ নেই। এখানেই তার শান্তনা।

শয়তান এ সুযোগকে সব সময় কাজে লাগায়। সব নবীর ইন্তিকালের পরই শয়তান বিভিন্ন কায়দায় সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নবীর শিক্ষাকে বিলীন করতে চেষ্টা করে। উম্মতকে তওহীদ ও রিসালতের পথ থেকে সরিয়ে বিদআত ও শিরকের পথে নিক্ষেপ করে। তার প্ররোচণায় নবীর উম্মত যখন বিদআতে লিপ্ত হয় তখন সে মানসিক তৃপ্তি বোধ করে এবং নবীর কবরের কাছে গিয়ে নবীকে ডেকে বলে; হে পয়গাম্বর! দেখে যাও তোমার উম্মতকে গুমরাহ বানিয়ে তোমার থেকে কেমন প্রতিশোধ নিলাম। নাউযু বিলাহ্‌।

শয়তান তুলনামূলকভাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.-এর উপর বেশী নাখোশ বিধায় তাঁর উম্মতকে বিদআতগ্রস্থ বানিয়ে আনন্দ বোধও করে তুলনামূলকভাবে বেশী। কোন মুসলমান যখন বিদআত কর্মে লিপ্ত হয় তখন শয়তানের আনন্দের সীমা থাকে না। এভাবে সমাজ যখন বিদআতের উপর চলতে থাকে তখন সে মদীনার রাসূল সা.কে প্রতিশোধের ভাষায় বলে, হে শেষ নবী! তুমি আমাকে আরব থেকে উৎখাত করেছো। দেখে যাও, কেমন প্রতিশোধ নিচিছ; রাজ্য তোমার অথচ কর্তৃত্ব চলছে আমার। নাম ব্যবহৃত হচেছ তোমার অথচ কাজ চলছে আমার; জনবল তোমার অথচ গোলামী করছে আমার; কুরআন কিতাব তোমার অথচ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চলছে আমার- ইত্যাদি। শয়তানের এসব প্রতিশোধ বাক্যগুলো শুনে তখন রওজা শরীফে অবস্থিত রাসূলুল্লাহ সা.-এর কলিজা ভেঙ্গে খান খান হয়ে যায়।

শয়তান অভিজ্ঞ। অত্যন্ত অভিজ্ঞ। পৃথিবীর যে কোন মানুষের তুলনায় তার অভিজ্ঞতা অনেক বেশী। সে দুষ্টামি করেছে হযরত আদম আ. এর সাথে। তারপর হযরত নূহ আ. এর সাথে। তারপর সকল

যুগের সকল পয়গাম্বরের সাথে। তারপর প্রত্যেক যুগের সহীহ ঈমান ও আমল বিশিষ্ট সকল মুসলমানের সাথে। পূর্ববর্তী এসব মানুষের সকলে চলে গিয়েছেন বা যাচেছন কিন্তু শয়তান রয়ে গেছে। সে আছে ও থাকবে। সকলের সাথে দুষ্টমির কাজ করে সে মহাঅভিজ্ঞ। সে অভিজ্ঞতার বিশাল পাহাড় নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। এমন অভিজ্ঞ দুষ্টের হাত থেকে বাঁচা সাধারণ মুসলমানের জন্য কি খুব সহজ ? মুমিনদের সাথে মহান আল্লাহর খাস রহমত বিদ্যমান আছে বলেই এখনো কিছু মুমিন সুন্নাতের উপর অটল। যদি এই রহমত না থাকতো তাহলে বহু আগেই তারা বিদআতের আবর্তে পড়ে দীন ও ঈমান খুইয়ে ফেলতে বাধ্য ছিল।

শয়তান অভিজ্ঞ ও চালাক বিধায় বিদআতকে পছন্দ করে। এমনকি আল্লাহ পাকের নাফরমানীর চেয়েও বিদআত তার কাছে বেশী পছন্দ। তাই কোন মুসলমান যিনা, ব্যভিচার, খুন-খারাবী করলে সে যতটা খুশি হয় তার চেয়ে বেশী খুশি হয় কোন মুসলমান সুন্নাত চেয়ে বিদআত কর্মে লিপ্ত হলে। প্রসিদ্ধ তাবি তাবিয়ী হযরত সুফয়ান আস সওরী স্পষ্ট বলেন,

ان البدعة احب الى ابليس من المعصية فان المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها اخرجه الامام السيوطى فى‌الامر بالاتباع

তিনি বলেন, ইবলীসের নিকট নাফরমানীর চেয়ে বিদআত বেশী প্রিয়। কারণ নাফরমানী থেকে তাওবা করার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু বিদআত থেকে তাওবা করার কোন সম্ভাবনা থাকে না[১১৭]।

মুসলিম সমাজে বিদআত চালু করার পেছনে শয়তানের কি জঘন্য মনোবৃত্তি একখানা হাদীসে তা স্পষ্ট নির্দেশ করা আছে। ইরশাদ হচেছ,

عن ابى بكر الصديق رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابليس قال اهلكتهم بالذنوب فاهلكونى بالاستغفار فلما رأيت ذالك اهلكتهم بالاهواء فهم يحسبون انهم مهتدون فلا يستغفرون رواه ابن ابى عاصم كذا فى الترغيب والترهيب

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, ইবলীস বলে, আমি বনী আদমকে বরবাদ করে দেই তাদেরকে গুনাহে পতিত করার দ্বারা। আর তারা আমার সকল মেহনত বরবাদ করে দেয় ইস্তগফার করার দ্বারা। যখন দেখলাম হায় ঘটনা তো এমন যে, আমি ঠকে যাচ্ছি তখন ভিন্ন পদ্ধতি শুরু করলাম। এখন আমি তাদের বরবাদ করছি বিদআতে লিপ্ত করার দ্বারা। তারা এটিকে নেক আমল জ্ঞান করে নিজেদেরকে হিদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে বোধ করছে। এখন আর কেউ গুনাহের কারণে ইস্তিগফারের চিন্তাও করে না[১১৮]।

বিদআত জঘন্য কাজ। কিন্তু লোকেরা এটিকে তুচছ মনে করে। এটাও শয়তানের কারসাজি। কাজটি তুচছ বলে দেখিয়ে তা সম্পাদনের রাস্তা তৈয়ার করে শয়তান। তারপর তুচছ কাজটির ভিত্তির উপরই সে নিজের মনঃস্কামনা পুর্ণ করে নেয়। মহানবী সা. তাই উম্মতের প্রতি ‎্েহশীল হয়ে এই কারসাজির কথাও জানিয়ে দেন। ইরশাদ হচেছ;

عن ابن عباس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فى حجة الوداع فقال ان الشيطان قد يئس ان يعبد بارضكم ولكنه رضى ان يطاع فى سوى ذالك مما تحاقرون من اعمالكم فاحذروا انى قد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا كتاب الله وسنة نبيه رواه الحاكم

---

১১৭. আল্লামা শাতিবী, আল ইতিসাম, ১/১১১; ইমাম সুয়ূতী, আল আমরু বিশ ইতিবা, পৃ. ১৯।
১১৮. আলামা মুনযিরী, প্রাগুক্ত, হাদীস ৮৭।

হযরত ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বিদায় হজ্জের সময়ে ভাষণে বলেন, শয়তান তোমাদের ভূখণ্ডে মূর্তিপুজা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে আজ সম্পূর্ণভাবে নিরাশ। তবে সে আশাবাদী মূর্তিপুজা ছাড়া অন্যান্য এমন কিছু বিদআত কাজ যেগুলোর সে তোমাদের মধ্যে চালু করবে, যেগুলোকে তোমরা জ্ঞান করবে তুচছ কাজ বলে। কাজেই সাবধান। তুচছতা দেখিয়ে সে যেন তোমাদেরকে বিদআত গিলাতে না পারে। আমি তোমাদের জন্য এমন জিনিস রেখে যাচিছ যদি তোমরা সে জিনিস দৃঢ়ভাবে ধরে রাখো তাহলে কখনো গুমরাহ হবে না। তা'হল মহান আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত[১১৯]।

বিদআত আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কাজ

গুনাহ ও নাফরমানীর মধ্যে সবচেয়ে বড় নাফরমানী হল মহান আল্লাহর সাথে শিরক করা। পবিত্র কুরআনের ভাষায় শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম। আল্লাহ জাল্লা শানুহু শিরকের গুনাহ মাফ করেন না। শিরক ছাড়া অন্য গুনাহ যাকে ইচছা মাফ করে দেন। শিরক ও কুফর মহান আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বিধায় বিদাআতও তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কারণ বিদআত হল শিরকের জন্ম দাতা, শিরকের জননী। পৃথিবীতে যুগে যুগে যে শিরকের উৎপত্তি ঘটেছে তার সবগুলো এই বিদআতের ভিত্তিমূল থেকেই সৃষ্ট। বিদআতের পরিণতি হল শিরক। বিদআতের পথ ধরেই শিরক সমাজের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। বিদআত সুন্নাতের সংহারক, সুন্নাত যা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর অতিপ্রিয় জিনিস দুষ্ট বিদআত সেই সুন্নাতেরই বিলুপ্তি সাধনকারী। বিদআত শরীঅত বিকৃতির গোপন পথ। এই গোপন পথেই শয়তান কোন মানুষকে শিরকের আস্তানায় নিয়ে হাজির করে। এসব কারণে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কাজ হল বিদআত। সাহাবী হযরত আবদুলাহ্ ইবন আব্বাস রা. বিদাআতের উপরোক্ত হাকীকত সম্পূর্ণ স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। ইরশাদ হচেছ,

عن عبد الله عباس رضى الله عنه قال ان من ابغض الامور الى الله تعالى البدع رواه السيوطى

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নিকট যে সব কাজ নিকৃষ্ট বিবেচিত তম্মধ্যে অন্যতম হল বিদআত করা[১২০]।

রাসূলুল্লাহ সা. বিদআত সম্পর্কে সাহাবীগণের অন্তরে এই ভাবধারাই সৃষ্টি করেন। ফলতঃ সাহাবীগণের সকলে বিদআতকে নেহায়েত মন্দ জিনিস ও অতিশয় নিকৃষ্ট কাজ বলে জ্ঞান করতেন। বিদআত কাজ করা বা সুন্নাতের খেলাফ কাজ করাকে তাঁরা কুফরীর মত জঘন্য ভাবতেন। ইরশাদ হচেছ,

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه انه قال صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر كذا فى الاعتصام

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফরের নামায হল দুই রাকাআত। যে ব্যক্তি সুন্নাতের খেলাফ করল সে যেন কুফরী করল[১২১]।

এই হাদীসে লক্ষণীয় যে, সাহাবী ইবন উমর রা. সফরের হালতে চার রাকাআত বিশিষ্ট নামায দু রাকাআত না পড়ে পূর্ণ চার রাকাআত পড়াকে কুফরীর মত মন্দ জিনিস বলে অভিহিত করেছেন। এ থেকে বুঝা যায়, কোন কাজ যদি নামাযের মত নিখুঁত ভাল জিনিসও হয় আর সেটি যদি রাসূলুল্লাহ সা.-এর তরীকা মত সম্পাদিত না হয় তাহলে সে কাজের দ্বারা সওয়াব আশা করা যায় না। বরং সেটি খেলাফে সুন্নাত ও বিদআত হওয়ার দরুন সবচেয়ে মন্দ কর্ম বলেও বিবেচিত হতে পারে। গবেষকগণ বলেন, নামায তথা রূকু সিজদা ইত্যাদি মৌলিকভাবে তাকওয়ার মানদণ্ড নয়। তাকওয়ার মানদণ্ড হল সুন্নাহ। সেই নামাযই আল্লাহর নিকট গৃহীত হয় যা সুন্নাহর মানদণ্ডে স্বীকৃত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ফজরের দুই রাকাআত ফরযের

---

১১৯. মুনযিরী, প্রাগুক্ত, হাদীস ৬৩।
১২০. ইমাম সুয়ূতী, আল আমরু বিল ইত্তিবা, পৃ. ৭।
১২১. ইমাম শাতেবী, আল ই'তিসাম, খ. ১, পৃ. ১০৯।

ক্ষেত্রে কেউ যদি তিন বা চার রাকাআত পড়ে তাহলে তার নামাযই হবে না। আরো উদাহরণ যেমন প্রত্যেক রাকাআতের মধ্যে একটি রুকু দুটি সেজদা। এখন কেউ যদি নিজ ইচছা মত প্রত্যেক রাকাআতে দুটি রুকু আর একটি সেজদা করে তাহলে নামায হবে না। এখানে কোন মন্দ কাজ করা হয়নি। শুধু এতটুকু করা হয়েছে যে, মহানবী যেভাবে নামায পড়তে বলেছেন সেভাবে আদায় করা হয়নি। সুন্নাতের খেলাফ করা হয়েছে মাত্র। সুন্নাত যেহেতু মানদণ্ড সেহেতু খেলাকে সুন্নাত সম্পূর্ণ ভূল ও অশুদ্ধ। তাছাড়া খেলাকে সুন্নাতকে পছন্দ করার মধ্যে প্রকান্তরে সুন্নতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ঘটে। এ কারণে সাহাবীগণ খেলাকে সুন্নাতকে কুফরীর মত খারাপ বলে বোধ করতেন।

খেলাফে সুন্নাত কাজ ও বিদআত কাজের ব্যাপারে সাহাবী হযরত ইবন মাসউদ থেকে কেমন মানসিকতা পাওয়া যায় তা নিম্নের হাদীসে লক্ষণীয়,

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال— لو صليتم فى بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم ولو

تركتم سنة نبيكم لكفرتم

হযরত ইবন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা যদি নিজ নিজ গৃহে নামায পড়তে থাকো এবং তোমাদের মসজিদে আসা বাদ দাও আহলে তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নাত পরিত্যাগ করলে। আর তোমরা নিজ নবীর সুন্নাহ পরিত্যাগ করে তার খেলাফ কিছু করা মানে তার সাথে কুফরী করা[১২২]।

সাহাবা ও তাবিয়ীন বিদআতকে কখনো প্রশ্রয় দেননি

রাসূলুলাহ সা.-এর পরে সাহাবায়ে কিরাম, তাবিয়ীন ও তাবে তাবিয়ীনের সকলে অভিন্নভাবে যে নীতি মেনে আসছেন সেটি ছিল বিদআতকে প্রশ্রয় না দেওয়া। তাঁরা সুন্নাতের উপর কঠিনভাবে আমল করতেন, সুন্নাতের দাওয়াত দিতেন। পাশাপাশি বিদআত থেকে কঠিনভাবে বেঁচে থাকতেন, বিদআতের খরাবী বর্ণনা করতেন। তাদের উপরোক্ত সচেতনতার কারণে তাদের যুগ খাইরুল কুরূনে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তীকালীন উম্মত এ ব্যাপারে সচেতন থাকেনি বলে শিরক ও বিদআত তাদের গ্রাস করে নেয়।

মহানবী সা.-এর মেহনতের ফলে শিরক ও বিদআতের প্রতি সাহাবীগণের মনে বিদ্বেষভাব এত প্রচণ্ডভাবে স্থাপিত হয়েছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন গায়রুল্লাহর প্রতি কোন ভক্তি দেখাতে সম্মত হতেন না। মাটি বা পাথর দ্বারা মূর্তি বানানো হয়। মানুষ দেবদেবী মনে করে সেই পাথরকে ভক্তি করে। মহানবীর শিক্ষা পেয়ে তারা কোন পাথরের প্রতি সাধারণ সম্মান প্রকাশেও তাঁরা দ্বিধা করতেন। তারা এ সম্মান প্রকাশ নিজের অজ্ঞাতে শিরক বা বিদআত হয়ে যায় কিনা সেই আশংকায় থাকতেন। হজ্জের সময় তাওয়াফের মধ্যে হজরে আসওয়াদকে চুম্বন করতে হয়। এটি শরীঅতের হুকুম। রাসূলুল্লাহ সা. নিজে চুম্বন করেছেন। অথচ এটি একটি পাথর মাত্র। তবে এটিও তো গায়রুল্লাহ। সাধারণ একটি পাথর মাত্র। এর মধ্যে কি ক্ষমতা আছে, ক্ষমতা তো সব আল্লাহর। তাই সায়্যিদুনা হযরত উমর সেই পাথরকে চুম্বন করতে এসেও দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন আর কি বললেন দেখুন। হাদীসে আছে,

عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقبل الحجر يعنى الاسود ويقول انى لاعلم انك حجر

لا تنفع ولا تضر ولولا انى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك قط رواه البخارى ومسلم

হযরত আবিস ইবন রাবীআ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. হজরে আসওয়াদ চুম্বন করছেন আর বলছেন, আমি সুনিশ্চিত জানি তুমি একটি পাথর মাত্র। তোমার মধ্যে না কোন উপকার করার ক্ষমতা আছে, আর না কোন অপকার করার ক্ষমতা আছে। যদি আমি

১২২. ....হাদীস, ৫৫০।

রাসূলুল্লাহ সা.কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম তাহলে কষ্মিকালেও আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না[১২৩]।

মুহাদ্দিসগণ বলেন, পাথরকে চুম্বন করার এই বিধান থেকে কেউ যেন কোন ভুল বুঝাবুঝির শিকার না হয় সে উদ্দেশ্যে হযরত উমর কথাটি বলে দেন। তিনি স্পষ্ট নির্দেশ করেন যে, ইট পাথর সেটি যদি হজরে আসওয়াদও হয় তবুও তার মধ্যে নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের। হ্যাঁ, রাসূল সা. সেই পাথরকে চুম্বন করেছেন বিধায় এটি সুন্নাতে পরিনত হয়েছে। তাই সুন্নাত হিসাবেই চুম্বনের আমল করা হবে পাথরের মধ্যে কোন শক্তি আছে সে হিসাবে নয়। আর সুন্নাতের অনুসরণের মধ্যে বরকত আছে।

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় রাসূলুল্লাহ সা. একটি বৃক্ষের নীচে বসে সাহাবীগণের নিকট থেকে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। কোন সন্দেহ নেই, আলাহর হাবীব সা. যে বৃক্ষের নীচে বসেছেন এবং যেখানে বসে সাহাবীগণের নিকট থেকে এমন এক মহা অঙ্গীকার নিলেন সেটি অবশ্যই বরকত ওয়ালা বৃক্ষ। পরবর্তীকালে দেখা গেল লোকেরা সেই বৃক্ষটিকে ভক্তি করতে শুরু করেছে। আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর রা. বিষয়টি খেয়াল করলেন। এটি ক্রমে কোন বিদআতের রূপ নিয়ে বসে কিনা সে জন্য তিনি বৃক্ষটি কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। ইরশাদ হচেছ,

ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما بلغه ان الناس يتناوبون الشجرة التى بويع تحتها بالنبى ارسل اليها فقطعها

رواه مجالس الابرار

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব যখন অবগত হলেন যে, লোকেরা পালাক্রমে সেই বৃক্ষটির কাছে যায় যেটির নীচে মহানবী সা.-এর পবিত্র হাতে বাইআত নেওয়া হয়েছিল। বিষয়টি দেখে হযরত উমর সেখানে লোক পাঠালেন এবং বৃক্ষটি কর্তন করে (বিদআত সৃষ্টির সম্ভাবনা) নির্মূল করে দেন[১২৪]।

সাহাবীগণ বিদআতকে কোনদিন প্রশ্রয় দিতেন না। কোথাও কোন বিদআত কর্ম হলে সেখানে নিজে উপস্থিতও থাকতেন না। যেন তাদের উপস্থিতিকে অন্যরা দলীল হিসাবে পেশ করতে সুযোগ না পায়। হাদীসে আছে,

عن مجاهد قال كنت مع ابن عمر رضى الله عنه فثوب رجل فى الظهر او العصر قال اخرج بنا فان هذى بدعة رواه

ابو داود

তাবিয়ী হযরত মুজাহিদ রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাহাবী হযরত ইবন উমর রা-এর সঙ্গে এক মসজিদে ছিলাম। এমন সময়ে এক ব্যক্তি যোহর কিংবা বলেছেন আছর নামাযের জন্য (আযানের পর ভিন্নভাবে) ডাকাডাকি করছিল। তখন হযরত ইবন উমর রা. বললেন, এইমসজিদ থেকে বেরিয়ে চল। কারণ এখানে বিদআত চলে[১২৫]।

নামাযের জন্য মানুষকে আহবান করার শরীঅত স্বীকৃত পদ্ধতি হল আযান। আযানের পরে ভিন্নভাবে কোন পদ্ধতিতে পুনরায় ডাকাডাকি করাকে 'তাসবীব' বলা হয়। এটি বিদআত। কারণ মহানবী সা. থেকে তাসবীবের কোন স্বীকৃতি নেই। হযরত ইবন উমর রা. যখন দেখলেন মসজিদে বিদআত চলে তখন সেই মসজিদে তার উপস্থিতিও তিনি পছন্দ করেননি। মোটকথা সাহাবীগণ কখনো বিদআতকে প্রশ্রয় দেননি বরং কঠিন হাতে প্রতিরোধ করতেন। এটিই যুগে যুগে হক্কানী মুসলমানের জীবন পদ্ধতি।

---

১২৩. ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, সূত্র ঃ আল মুনযিরী, হাদীস ৬৭।
১২৪. মাজালিসুল আবরার, পৃ. ১২১।
১২৫. ইমাম আবূ দাউদ, হাদীস ৪৫৩।

বিদআত পরিহার করে চলা পরহেযগারীর লক্ষণ

বর্তমানে মুসলিম সমাজে নানা ধরনের বিদআত চালু আছে। লোকেরা এগুলোকে নেকআমল হিসাবে সম্পাদন পূর্বক ধর্মীয় তৃপ্তি লাভ করে। আবার একদল আছেন যারা বিদআত পরিহার করে চলেন। প্রশ্ন হল কোন দল বাস্তবভাবে পরহেযগার। গবেষক আলিমগণ বলেন, মুসলিম সমাজে বিদআত চালু হয়ে যাওয়ার পর বর্তমানে মুসলমানরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী যারা বিদআত পালন করে ও বিদআতের সমর্থক। অপর শ্রেণী যারা বিদআত পরিহার করে চলে ও প্রতিরোধের চেষ্টা করে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে শেষোক্ত শ্রেণী ভাল। শেষোক্ত শ্রেণী পরহেযগার। কেননা- সাহাবী ও তাবিয়ীনের জীবনাদর্শ এই শেষোক্ত শ্রেণীর সঙ্গেই মিলে।

শেষ যামানায় মুসলিম সমাজে যখন নানা রকমের বিদআত ছড়িয়ে পড়বে তখন যেই মুসলমান বিদআত থেকে বেঁচে থাকবে, বিদআত পরিহার করে চলবে এবং বিদআতের প্রতিরোধ করবে তাদের সওয়াব ও পুরস্কার অপরিসীম। একখানা হাদীসে তাদের এক একজনকে নবী যুগের ৫০ (পঞ্চাশ) জন সাহাবীর সম পরিমাণ নেক আমল প্রদানের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

عن ابى ثعلبة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.... فان ورائكم ايام الصبر فمن صبر فيهن قبض على الجمر للعامل فيهن اجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله قالوا يا رسول الله اجر خمسيم منهم قال اجر خمسين منكم رواه الترمذى وابن ماجه كذا فى مشكواة المصابيح

হযরত আবূ সালাবা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা.ইরশাদ করেছেন, ---- সম্মুখে এমন যুগ আসবে যখন মুমিনের জন্য সবর করা ব্যতিরেকে আর কোন পথ থাকবে না। আর যে সবর করবে তার অবস্থাও হবে হাতের তালুর উপর জলন্ত অঙ্গার ধারণকারীর ন্যায়। সে যুগে যে ব্যক্তি শরীঅত ও সুন্নাতের উপর নিজের আমল পূর্ণাঙ্গ রাখবে তাকে দেওয়া হবে ৫০ (পঞ্চাশ) জন আমলকারীর সমপরিমান সওয়াব। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলালাহ! তাদেরই পঞ্চাশ জনের সমপরিমাণ? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, না বরং তোমদের (সাহাবীদের) পঞ্চাশ জনের সমপরিমাণ সওয়াব প্রদান করা হবে[১২৬]।

হযরত মোল্লা আলী কারী রহ. লিখেছেন, সাহাবীগণের সাহাবী হওয়ার কারণে সকল উম্মতের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বেশী তাতে কোন সন্দেহ নেই। এটি তাদের সাধারণ মর্যাদা। কিন্তু শেষ যামানার কোন কোন উম্মতকে পঞ্চাশ সাহাবীর নেক আমল প্রদান এটি একটি বিশেষ মর্যাদা ও একটি বিশেষ ব্যাপার। এই বিশেষ ব্যাপারের কারণে তিনি কোন সাহাবীর চেয়ে বেশী সম্মানী বা কোন সাহাবীর চেয়ে বড় হয়ে যান না এবং তাতে সাহাবীগণের সাধারণ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বও ক্ষুন্ন হয় না।

যারা বিদআত পরিহার করে চলেন ও বিদআত প্রতিরোধের চেষ্টা করেন তাদের অল্প চেষ্টার প্রতিদানও অনেক। হাদীসে আছে,

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم فى زمان من ترك منكم عشر ما امر به هلك ثم يأتى زمان من عمل منهم عشر ما امر به نجا رواه الترمذى كذا فى مشواة المصابيح

হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, (হে আমার সাহাবীগণ) তোমরা এমন যুগে বাস করছো যে, তোমাদের কেউ সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার এই বিধান থেকে যদি দশভাগের একভাগও ছেড়ে দেয় তাহলে সে হালাক হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে তোমাদের পরে আসবে আরেক যুগ যখন তাদের কেউ ঐ বিধানের দশভাগের একভাগও পালন করবে সে নাজাত পেয়ে যাবে[১২৭]।

১২৬. ইমাম তিরমিযী, ইবন মাজা, মিশকাত, পৃ. ৪৩৭।
১২৭. ইমাম তিরমিযী, মিশকাত, পৃ. ৩১।

উল্লেখ্য সাহাবা যুগ ছিল ইসলামের উত্থানের যুগ। চতুর্দিকের সকল উপকরণ ছিল উত্থানের পক্ষে। পক্ষান্তরে পরবর্তী যুগগুলো হল ইসলামের পতন যুগ। চতুর্দিকের সকল উকরণ হল পতনের পক্ষে। এমন যুগে বিদআতের বিপক্ষে অবস্থান করার অর্থ হল স্রোতের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করা। এ কারণে সেই যুগে সামান্য আদেশ নিষেধ পালন করাও নাজাত প্রাপ্তির উপযোগী আমল বলে বিবেচিত হবে।

বিদআত থেকে বেঁচে থাকা শ্রেষ্ঠ বুযর্গী ও পরহেযগারী তাতে সন্দেহ নেই। তবে নিজের মধ্যে এই আমল পয়দা করা অত্যন্ত কঠিন। আলিমগণ বলেন, কঠিন মুজাহাদা ছাড়া বিদআত থেকে বাঁচা যায় না। দেখা যায় যে, বিদআত না করার কারণে ব্যক্তিকে অনেক কিছু হারাতে হয়, তাকে দুনিয়ার অনেক প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়, সে নিজ পরিবার ও আপনজনদের কাছেও প্রিয় থাকতে পারে না। এ সব কিছু আল্লাহর জন্য ত্যাগ করার পরই কোন মুসলমান বিদআত থেকে রেহাই পেতে পারে। বিদআত পরিহারের এ পথ অতি দুর্গম বিধায় এ পথের সওয়াবও বেশী। হাদীসে আছে,

عن عبد الرحمن بن العلاء الحضرمى قال حدثنى من سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول انه سيكون فى آخر هذه الامة قوم لهم اجر اولهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون اهل الفتن رواه البيهقى كذا فى مشواة المصابيح

হযরত আবদুর রহমান ইবন আলা আল হাযরামী বলেন, আমাকে জনৈক সাহাবী বলেছেন, যে মহানবী সা. ইরশাদ করেছেন, এই উম্মতের শেষ যামানায় এমন কিছু লোক আসবে যাদেরকে তাদের পূর্ববর্তীদের (সাহাবীদের) ন্যায় সওয়াব প্রদান করা হবে। তারা হল সে সব লোক যারা সৎকাজের আদেশ দেয়, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং বিদআতীদের প্রতিরোধ করে[১২৮]।

ইলম ও ইত্তিবায়ে সুন্নাতের প্রসারতা দিয়েই বিদআত দুর করা যায়

বিদআত হল অন্ধকার। এটি জন্ম নেয় মূর্খতা থেকে। রাতের আধার যা আপনাকে রাস্তায় হাঁটতে দিচেছ না, আপনার পথ রোধ করে আছে- একে রূঢ় ভাষায় বকাঝকা করে কিংবা লাঠি পেটা করে তাড়ানো যাবে না। আলো জ্বালিয়ে দিন। অন্ধকার আপনা থেকেই হটে যাবে। বিদআতও তদ্রুপ। রাগারাগি করে বা বকাঝকা করে বিদআতকে তাড়ানো যায় না। জ্ঞানের বাতি জ্বালানো হলে এবং সুন্নাতের আমল শুরু হলে বিদআত আপনা থেকেই পালিয়ে যায়।

এককালে হক্কানী উলামা বিদআত প্রতিরোধে বাহাস মুনাজারা করতেন। তখন হয়ত বাহাস মুনাজারার উপকারিতা ছিল। বর্তমানে সে সব বিতর্কেও কোন উপকারিতা নেই। বরং ক্ষতি হয়। বিতর্কের দ্বারা প্রতিপক্ষ হিদায়েতের দিকে আসে না। অধিকন্তু নিজ অভিমতের উপর আরো দৃঢ় হয়ে যায়। গুমরাহী পাকা পোক্ত হয়। এ জন্য এই যুগে বাতিল প্রতিরোধে আলিমগণ বিতর্ক বা মুনাজারা পছন্দ করেন না।

রাসূলুল্লাহ সা. এর কোন সুন্নাত পালনের মধ্যে গভীর আনন্দ ও সাধ আছে। এই স্বাধ প্রথমেই পাওয়া যায় না। আমল শুরু হলে এবং প্রিয়নবীর আমলের সাথে নিজের আমলকে সাজুর্যপূর্ণ বানানোর মেহনত ধরে রাখা হলে এক পর্যায়ে সেই স্বাধ উপভোগ শুরু হয়। তখন সুন্নাত ছাড়া অন্য কিছুই মজা লাগে না। আর সুন্নাতের মজা দিন দিন এমন বৃদ্ধি পায় যে, কোন কাজ সুন্নাতের বাইরে চলে গেলে মওতের মত কষ্ট অনুভূত হয়।

মুমিন বান্দার জীবনে সুন্নাতের আমল যত বাড়ে ততই তার জিন্দেগী থেকে বিদআত দূর হতে থাকে। সুন্নাত ও বিদআত একটি অপরটির বিপরীত। কোন কাজ সুন্নাত মোতাবেক সম্পাদিত হলে সেখানে আর বিদআত থাকতে পারে না। আবার সুন্নাত মোতাবেক সাজানো না হলেই সেখানে বিদআত অনুপ্রবেশের সুযোগ পায়। তাই জীবনে সুন্নাতের আমল যত বাড়বে ও বাড়ানো যাবে বিদআত ততই বিদুরীত হতে থাকবে। কোন সমাজে সুন্নাতের অনুশীলন যত বাড়বে সেই সমাজ থেকে বিদআত ততই বিদূরিত হবে।

১২৮. ইমাম বায়হাকী, মিশকাত, পৃ. ৫৮৪।

এভাবে ব্যক্তি ও সমাজে সুন্নাত যদি ব্যাপক ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তখন সেখান থেকে বিদআত সমূলে উৎখাত হয়ে যায়। এ কারণেই মহানবী সা. উম্মতকে সুন্নাতের উপর দৃঢ় থাকা এবং সুন্নাত প্রতিষ্ঠার মেহনত করার জন্য সবিশেষ তাকিদ দিয়ে গিয়েছেন।

দীনের কাজ দুভাবে করা যায়। ইসবাতী (ইতিবাচক পদ্ধতি) ও দিফায়ী (নেতিবাচক পদ্ধতি)। ইসবাতী মানে প্রতিষ্ঠামূলক কর্মসূচীর উপর কাজ করা। আর দিফায়ী মানে প্রতিরোধমূলক কর্মসূচির উপর কাজ করা। মহানবী সা. উভয় পদ্ধতিতেই কাজ করেছেন। তবে মক্কী জীবনে মৌলিকভাবে কাজ করেছেন ইসবাতী পদ্ধতিতে। কাজের ক্ষেত্রে এটি অধিকতর শক্তিশালী। বিশেষতঃ আপন লোকদের মধ্যে কাজ করতে গেলে ইসবাতী পদ্ধতি বেশী উপকারী। মুসলমানদের যারা বিদআত করে তারা তো দূরের কেউ নয়। সুন্নাত সমর্থকদেরই ভাই বেরাদর ও আত্মীয় স্বজন। তারা একান্ত আপনজন। কাজেই তাদের মধ্যে ইসবাতী পদ্ধতি অনুসারে কাজ করাই উত্তম। রাসূলুল্লাহ সা. মানুষকে প্রধানত এইইয়ায়ে সুন্নাতের উপর আমল করতে নির্দেশ দানের মূল কারণও হল এটি।

মোটকথা সমাজ থেকে বিদআত দুর করতে হলে প্রধানতঃ দুটি কাজ করতে হয়। এক. সহীহ ইলমের বিকাশ সাধন। এ ক্ষেত্রে দীনী মাদ্রাসা ও শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা যায়। খেয়াল রাখতে হবে যে, মাদ্রাসা যেন নাম কা ওয়াস্তে না হয় বরং এমন মাদ্রাসা হয় যা গুণগত ভাবে নিজের চতুর্দিকে দীন ও সুন্নাতের আলো ছড়ায়। দুই. সুন্নাতের বিস্তার সাধন। এ ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে কোন প্রকার অতিশয়তা বা বাড়াবাড়ি না ঘটে। পবিত্র কুরআন ও মহানবী সা. থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসের নিরিখে যেন সকল কার্যসম্পাদিত হয়। এ সব কারণে একখানা হাদীসে হযরত আলী রা. সমাজে ইলমের বিকাশ ও সুন্নাতের প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষভাবে তাকিদ করেন। ইরশাদ হচেছ,

عن علی بن ابی طالب رضی الله عنه قال تسارعون فی طلب العلم والسنة والقرآن واقتبسوها من صادق قبل ان يخرج اقوام من امتی من بعدی يدعونكم الی تأسيس البدعة والضلالة رواه الفردوس

হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা ইলমের অন্বেষা এবং কুরআন ও সুন্নাহ প্রতিষ্ঠায় পারস্পরিক প্রতিযোগিতার সাথে কাজ কর। তা ছাড়া এগুলো আহরণ কর সত্যবাদীদের নিকট থেকে। এ কাজগুলো সম্পাদন কর সেই সময় আসার আগে যখন সমাজে বের হবে এমন লোকেরা যারা তোমাদেরকে আহবান করবে বিদআত ও গুমরাহী প্রতিষ্ঠার দিকে[১২৯]।

বিদআত জন্ম নেয় অতি সংগোপনে

বিদআত যখন জন্ম নেয় তখন জন্ম নেয় খুব গোপনভাবে সুক্ষ্ম কোন স্থানে। তারপর ধীরে ধীরে লালিত হয়ে রূসুম বা প্রথা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতিশয় গোপনভাবে জন্ম নেওয়ার কারণে বিদআতকে তাৎক্ষণিক ভাবে চেনা যায় না। তাছাড়া নতুন কোন কাজ যথারীতি রেওয়াজে পরিণত না হলে সেটি বিদআত হয় না। সেটি কোন ব্যক্তি ও ব্যক্তির ব্যক্তিগত অভিমত হিসাবে বিবেচিত থাকে। উল্লেখ্য ব্যক্তিগত আমল বিবেচনার সুযোগ পথে বিদআত সমাজে লালিত পালিত হয় ও বেড়ে উঠে। অবশেষে প্রথার পর্যায়ে গেলে এটি বিদআতের শিরোনামে তালিকাভূক্ত হয়। এমন বহু বিদআত আছে যেগুলো সুচনা পর্বে একান্ত শরীঅতের হুকুম কিংবা নেক আমল এমন কিছুই মনে করেনি। অথচ এটিই দিনে দিনে সকলের মধ্যে বিস্তার লাভ করে এক পর্যায়ে শরীঅতের হুকুম বা নেক আমলের আসন দখল করে নিয়েছে।

অতি সংগোপনে জন্ম ও লালিত হওয়ার কারণে স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায় যে, এতে কোন জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিও আক্রান্ত হয়ে যেতে পারেন। এটা সেই জ্ঞানী বুযর্গের ক্রটি নয়। হ্যাঁ, বিদআত কর্মটি দলীল পত্রের নিরিখে বিদআত বলে চিহ্নিত হওয়ার পর যদি কেউ তা জেনে শুনে গ্রহণ করে সেটি দোষের বিষয়। ইতিহাসে দেখা যায় যে, এমন কিছু বড় বড় বুযর্গ আলিম পূর্বে গিয়েছেন যারা হয়ত কোন কোন বিদআত

১২৯. ইমাম ফেরদাউস, আল মুসনাদ, হাদীস ২২৬১।

কর্মের সাথে জড়িত ছিলেন। তাঁরা বিদআত কাজটি করেছেন দেখে পরবর্তী কালের কোন কোন লোক এটিকে শুদ্ধ জ্ঞান করতে শুরু করেছে। অথচ পরবর্তীকালীন মুসলমানদের এ সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। কেননা- কোন কাজের সুন্নাত হওয়া বা বিদআত হওয়ার মানদণ্ড কোন আলিম নয়। মানদণ্ড হল কিতাব ও সুন্নাহ। আবার বিদআত প্রতিরোধের দাবী উত্থাপন দ্বারা পূর্বের কোন আলিমকে হেয় করাও ঠিক নয়। বরং বুঝতে হবে যে, বিদআত গোপনে ইসলামের গৃহে ঢুকে। চিহ্নিত হওয়ার পূর্বে কোন ভাল মানুষও তাতে আক্রান্ত হয়ে যেতে পারেন। আর অনিচ্ছাকৃত এই আক্রান্ত হওয়ার কারণে তাঁকে হেয় মনে করা মারাত্বক ভুল। আবার এটাও বুঝতে হবে যে, ভাল মানুষটি আক্রান্ত হওয়ার দ্বারা বিদআত কর্মটি সুন্নাতে পরিণত হয়ে যায় না। ভাল মানুষটির ব্যাপারে ভাল ধারণা পোষণ করেও বিদআতের প্রতিরোধ করা যায়।

আকীদা ও আমলের বিদআত

আকীদা ও আমলের সমন্বিত নামই হল শরীঅত। উভয় শরীঅতের অঙ্গ। তবে গুরূত্বের মধ্যে পার্থক্য আছে। আকীদা আমলের চেয়ে বেশী স্পর্শকাতর। আমলের ত্রুটি ব্যক্তির মান ক্ষুন্ন করে কিন্তু ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে দেয় না। পক্ষান্তরে আকীদার ত্রুটি ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। এ জন্য আকীদার ব্যাপারে মুমিন বান্দাকে তুলনামূলকভাবে বেশী সাবধান থাকতে হয়।

বর্তমান মুসলিম সমাজে চলমান বিদআতগুলো আকীদা ও আমল উভয় অঙ্গনেই ছড়ানো। কিছু বিদাআত আকীদার সাথে সম্পর্কিত। যেমন, রাসূলুল্লাহ সা. কে সর্বত্র হাজির নাজির বিশ্বাস করা বা রাসূলুল্লাহ সা. কে আলিমুল গায়ব মনে করা ইত্যাদি। আবার কিছু বিদআত হল আমলের সাথে সম্পর্কিত। যেমন- মৃত্যুর পর চল্লিশা করা বা কুলখানি করা ইত্যাদি। উভয় শ্রেণীর মধ্যে আকীদার বিদআত জঘন্য। কেননা আকীদার ক্ষেত্রে সূচিত বিদআতের কারণে অনেক সময় মানুষ বাহ্যত মুসলমান থাকলেও প্রকৃত প্রস্তাবে মুশরিকে পরিণত হয়ে যায়। আল্লাহ সকলকে হেফাযত করুন।

বিদআতের প্রচলন দানকারী মহাপাপী

বিদাআত করা গুনাহের কাজ। যে বিদআত করে সে পাপী। তার চেয়েও মহাপাপী হল ঐ ব্যক্তি যে কোন বিদআতের সৃষ্টি করে কিংবা বিদআতের দিকে মানুষকে আহবান করে কিংবা সমাজে বিদআত চালু করার কাজে সাহায্য করে। এদেরকে মহাপাপী বলা হয় এ জন্য যে, মানুষ পাপ করলেও পাপের একটি সীমানা বা সংখ্যা থাকে। কিন্তু, এ লোকগুলো এমন যে, তাদের পাপের সীমানা তারা নিজেরাও কখনো নির্ধারিত করতে সক্ষম হবে না। অন্যান্য পাপ আল্লাহর নিকট বিশুদ্ধ চেত্তে ক্ষমা চাইলে মাফ হয়ে যায়। আমলনামা থেকে পাপের তালিকা মুছে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে বিদআত সৃষ্টির গুনাহ ব্যক্তি ক্ষমা চাওয়ার পরেও এমনকি তার মৃত্যুর পরেও আমলনামায় গিয়ে সংযুক্ত হতে থাকে। মহান আল্লাহর বিধান হল, কেউ কোন মন্দ কাজের সূচনা করলে কিংবা আহবান করলে কিংবা চালু হওয়ার কাজে সহযোগিতা করলে এ পথে যত মানুষ চলবে এবং যতদিন পযন্ত কাজটি চালু থাকবে ততমানুষ ও ততদিন পযন্ত তার আমলনামায় গুনাহ লিপিবদ্ধ করা অব্যাহত থাকবে। হযরত আদম আ.-এর সন্তান কাবীল পৃথিবীতে নরহত্যার সূচনা করে। তাই কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত নরহত্যা ঘটবে সূচনাকারী হিসাবে সকল নরহত্যার একটি একটি গুনাহ কাবীলের আমন নামায় লিপিবদ্ধ হবে। ইরশাদ হচেছ,

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس تقبل ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل رواه البخارى ومسلم

হযরত আবদুলাহ্ ইবন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী সা. ইরশাদ করেছেন, যে কোন মানুষই অন্যায়ভাবে খুন হলে এর একটি গুনাহ্ হযরত আদম আ.-এর প্রথম সন্তান (কাবীল)-এর উপর বর্তাবে। কেননা সে জগতে খুনের সূচনা করেছিল[১৩০]।

এ জন্য কোন মন্দ কাজের রেওয়াজ চালু করার পূর্বে গভীর চিন্তা করা আবশ্যক। রেওয়াজ চালু হয়ে গেলে একটি মন্দ কাজ হিসাবে গুনাহ্ একটি থাকে না বং কোটি কোটি গুনাহে পরিণত হয়ে যায়। কাবীলের জন্য আফসুস। বেচারা মরে পঁচে মাটি হয়ে গিয়েছে। অথচ আজো যত হুন খারাবী হচেছ সবগুলোর একটি একটি গুনাহ্ কবরে কাবীলের আমলনামায় গিয়ে সংযুক্ত হচেছ।

বিদআত কাজের আহবান কিংবা সহযোগিতা পেয়ে যারা বিদআতে লিপ্ত হবে তারা নিজেরা তো গুনাহগার হবেই। অধিকন্তু বিদআতে লিপ্ত হয়ে অনুসারীরা সন্মেলিতভাবে যে পরিমাণ গুনাহে অংশিদার হবে সে পরিমাণ গুনাহ আহবানকারী ও সহযোগিতাকারী একার জন্যও লিখে দেওয়া হবে। ইরশাদ হচেছ,

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ما من داع يدعو الى شئ الا وقف يوم القيامة لازما لدعوته ما دعا اليه وان دعا رجل رجلا رواه ابن ماجه

হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেছেন, দুনিয়ায় যে ব্যক্তি যে জিনিসের দিকে আহবান করুক না কেন কিয়ামত দিবসে তাকে তার আহবান ও আহবানের ফলাফলসহ দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। এমন কি এক ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে আহবান করলেও[১৩১]।

عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى عن ابى عن جدى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه اوزار من عمل بها لا ينقص من اوزار من عمل بها شيئا رواه بن ماجه

হযরত কাছীর ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন আমর ইবন আউফ আল মুযানী তার পিতা ও দাতার সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বিদআত কাজের সূচনা করে অতঃপর সে অনুসারে আমল চালু হয় সে ব্যক্তির আমলনামায় যারা বিদআতের উপর আমল করবে তাদের সকলের গুনাহ তুলে দেওয়া হবে। তবে যারা সেই বিদআতের উপর আমল করবে তাদের নিহেদের গুনাহের মধ্যেও বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবে না[১৩২]।

عن واثلة بن الاسقع رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة فله اجرها ما عنل بها فى حياته وبعد مماته حتى تترك ومن سن سنة سيئة فعليه اثمها حتى تترك ومن مات مرابطا جرى عليه عمل المرابط حتى يبعث يوم القيامة رواه الطبرانى

হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী সা. ইরশাদ করেছেন যে, ব্যক্তি কোন ভাল কাজের (সুন্নাতের) প্রচলন করবে সে ঐ ভাল কাজটির আমল যতদিন অব্যাহত থাকবে ততদিন পর্যন্ত সওয়াব পেতে থাকবে। তার জীবদ্দশায় এমনকি মৃত্যুর পরেও কাজটির উপর আমল বন্ধ হওয়া পর্যন্ত। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজের (বিদআতের) প্রচলন করবে তার উপর গুনাহ্ লেখা অব্যাহত থাকবে কাজটি বন্ধ হওয়া পর্যন্ত। আর যে ব্যক্তি দীনের পাহারাদারীর কাজে থাকা অবস্থায় মারা যায় তার আমলনামায় পাহারা দানের অব্যাহত সওয়াব লেখা হবে। এমনকি এই সওয়াব প্রাপ্তি অবস্থায় তাকে কিয়ামত দিবসে উত্থিত করা হবে[১৩৩]।

---

১৩০. ইমাম বুখারী, হাদীস ৬৮৬৭; ইমাম মুসলিম, হাদীস ১৬৭৭; ইমাম তিরমিযী, হাদীস ২৬৭৩; মুনাযিরী, হাদীস ৯৬।

১৩১. ইমাম ইবন মাজা, বাবু মান ছান্না সুন্নাতান হাসানা, হাদীস ২০৭, পৃ. ১৩৬; মুনাযিরী, হাদীস ৯৯।

১৩২. ইমাম ইবন মাজা, হাদীস ২০৯, পৃ. ১৩৭।

১৩৩. মুনযিরী, হাদীস, ৯৭।

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে একটা অনুমান মেলে যে, কোন বিদআত কিংবা কোন মন্দ কাজের প্রচলন ঘটানোর পাপ কত জঘন্য ও কি পরিমাণের। ফকীহ মুফতীগণ মুসলমানদের সমাজে কোন বিদআত চালু করা বা কোন বিদআত অব্যাহত রাখার কাজে যারা সহযোগিতা করে সে আলিম হোক কিংবা সাধারণ কোন মুসলমান তাদেরকেও এই হুকুমের মধ্যে শামিল বলে অভিমত দিয়েছেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এ পর্যায়ের গুনাহ থেকে তাওবা করেও উদ্ধার পাওয়া কঠিন হয়। কেননা মৃত্যুর পর কবরে চলে গিয়েও এই গুনাহ থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। এ গুনাহ কবরে গিয়েও তার আমলনামায় সংযুক্ত হয়, তাও একজনের নয়; বিদআতটির উপর আমলকারী কোটি কোটি মানুষের গুনাহ। একদিন দুদিন নয়; কিয়ামত পর্যন্ত। এ সব কারণে বিদআত প্রচলনের গুনাহকে শুধু পাপই নয় মহাপাপ বলে অভিহিত করা হয়।

বিদআতীকে আল্লাহ ও তাঁর নবীগণ লানত করেন

'লানত' আরবী শব্দ। মানে অভিশাপ দেওয়া, বদদুআ করা ও অনিষ্ট কামনা করা। মহান আলাহ কিংবা তাঁর নবীগণ সাধারণতঃ কখনো কারো অনিষ্ট কামনা করেন না। বরং নবীগণ সকল সহনশীলতা ও ত্যাগের বিনিময়ে হলেও মানুষের কল্যাণ চান। জীবনের মহাশক্র লোকটির জন্য তাঁরা আন্তরিক হিতাকাংখী। এতদসত্ত্বেও কোন কোন পাপকর্ম এমন আছে যেগুলোর কারণে ব্যক্তি কল্যাণ কামনার উপযোগী থাকে না। তখন সেই ব্যক্তির উপর লানত করা হয়ে থাকে। বিদআত সেই পর্যায়েরই পাপ। বিদআতের ফলে ব্যক্তি আসমানী অনুগ্রধিকৃত হয়। দয়াল নবী রহমাতুল লিল আলামীনের কাছেও অভিশপ্ত বিবেচিত হয়। হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে,

عن عائشة رضى الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة لعنتهم لعنهم الله وكل نبى يجاب الزائد فى كتاب الله والمكذب بقدر الله والمسلط بالجبروت ليعز من اذله الله ويذل من اعزه الله والمستحل لحرم الله والمستحل من عترتى ما حرم الله التارك لسنتى رواه البيهقى كذا فى مشكواة المصابيح

হযরত আইশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, ছয় ব্যক্তি যাদেরকে আমি লানত করি, আল্লাহ লানত করেন এবং সকল নবী- যাদের দুআ সব সময় কবুল হয়ে থাকে- তাঁরাও লানত করেছেন। এরা হল এক. আল্লাহর বিধানের মধ্যে যে বিদআতের বৃদ্ধি ঘটায়। দুই. আল্লাহর দেওয়া তাকদীরকে যে অস্বীকার করে। তিন. জবরদস্তিমূলক যে ক্ষমতা দখল করে নিয়ে অধমদেরকে ইজ্জতের আসনে বসায় ও ইজ্জত সম্পন্নদেরকে অধমে পরিণত করে। চার. হরমের ভিতর যে রক্তপাত হালাল জ্ঞান করে। পাঁচ. আমার বংশের অন্তর্ভূক্ত হয়েও যে আল্লাহর দেওয়া হারাম বিধানকে হালাল জ্ঞান করে। ছয়. যে আমার সুন্নাতের পরিত্যাগকারী[১৩৪]।

উপরোক্ত হাদীসে الزائد فى كتاب الله (আল্লাহর বিধানের মধ্যে বিদআত সৃষ্টিকারী) কথাটি লক্ষ্যণীয়। আল্লাহর বিধানে যেমন কোন কিছু হ্রাস করা যায় না যেমনি তাতে নিজ থেকে কোন কিছুর সংযোজনপূর্বক বৃদ্ধি ঘটানোর অনুমতিও নেই। বৃদ্ধি ঘটানো মানেই হল বিদআত সৃষ্টি করা। আলিমগণ লিখেছেন, কোন জিনিসকে শরীঅতের হুকুম বলে চালু করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের। এ ক্ষেত্রে অন্য কারো অংশিদারী নেই। আল্লাহর এ বিধানের মধ্যে বিদআতের সংযুক্তি দ্বারা যে ব্যক্তি কোন কিছুর বৃদ্ধি ঘটায় সে প্রকারান্তরে নিজেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ন্যায় বিধানদাতা হিসাবে দাঁড় করায়। সে নিজেকে ক্ষুদ্র পরিসরের বিধানদাতা খোদা কিংবা বিধানদাতা রাসূল হিসাবে প্রমাণ করে। এ কারণে বিদআত সৃষ্টিকারীকে আল্লাহ ও তাঁর সকল নবী এমনকি শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সা. নিজে লানত করেছেন।

---

১৩৪. ইমাম বায়হাকী, সূত্র ঃ মিশকাত, পৃ. ২২।

বিদআতীকে আশ্রয় কিংবা প্রশ্রয় দেওয়া নিষেধ

কোন অপরাধকে আশ্রয় বা প্রশ্রয় দেওয়া নিজে সেই অপরাধ করারী শামিল। বিদআতকে আশ্রয় দেওয়া শুধু অপরাধের শামিলই নয় বরং বিদআত সৃষ্টির মত মারাত্মক কবীরা গুনাহ। কোন বিদআতের প্রতি দয়া করার অর্থ হল সুন্নাতের সাথে খিয়ানত করা। হিংস্র বাঘের প্রতি দয়া করার অর্থ হল নিরিহ বকরীর উপর জুলম করা। হাদীসে মহানবী সা. বিদআতের আশ্রয় দানকারীকেও অভিশপ্ত বলে অভিহিত করেছেন। ইরশাদ হচেছ,

عن الحسن البصرى رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال من احدث حدثا او آواى محدثا فعليه لعنة الله والملئكة و الناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل رواه ابو داود فى مراسيله

হযরত হাসান বসরী রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী সা. ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন বিদআত চালু করে কিংবা যে কোন বিদআতীকে আশ্রয় দেয় তার উপর পতিত হয় মহান আল্লাহর লানত, ফেরেশতাদের লানত ও সকল মানুষের লানত। তার ফরয কিংবা নফল কোন ইবাদতই কবুল করা হয় না[১৩৫]।

عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير منار الارض رواه مسلم

হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে পশু যবাহ করে তার উপর আল্লাহ পাকের লানত বর্ষিত হোক; যে ব্যক্তি কোন বিদআতীকে আশ্রয় দেয় তার উপর আল্লাহ পাকের লানত বর্ষিত হোক; যে ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয় তার উপর আল্লাহ পাকের লানত বর্ষিত হোক; যে ব্যক্তি যমীনের আইল পরিবর্তন করে তার উপর আলাহ্ পাকের লানত বর্ষিত হোক[১৩৬]।

বিদআতীর কোন নেক আমল কবুল হয় না

বিদআত স্বয়ং একটি অপরাধ, একটি ত্রুটি, একটি মহাব্যাধি। আফসুস এই বিদআতকেই লোকেরা দুআ কবূলের উসীলা হিসাবে জ্ঞান করে। কোন কোন রোগ এমন আছে যেগুলো শরীরে থাকা অবস্থায় ব্যক্তির শরীরে কোন ভিটামিন বা ঔষধ কাজ করে না বিদআত তদ্রূপ। কারো ঈমানী যিন্দেগীতে বিদআত বিদ্যমান থাকলে সে বস্তুতঃ রূহানী মহাব্যাধিতে আক্রান্ত। যতক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যাধি বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোন আমল কবুল হয় না, হতে পারে না। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابى الله ان يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته رواه بن ماجه

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, কোন বিদআতকারীর আমল বিদআতকারী সেই বিদআত পরিত্যাগ করা পর্যন্ত কবুল না করার মর্মে মহান আলাহ্ অস্বীকৃতি জানিয়ে দিয়েছেন[১৩৭]।

উলামা লিখেছেন, হাদীসে বর্ণিত 'আবা' (আলাহ্ অসম্মতি বা অস্বীকৃতি জানিয়েছেন) এর অর্থ হল যদি বিদআতকারী সেই ব্যক্তির পক্ষে কেউ সুপারিশও করে তবুও আল্লাহ জালা- শানুহু তার আমল কবুল

---

১৩৫. ইমাম আবূ দাউদ, আল মারাসীল, পৃ. ২০।
১৩৬. ইমাম মুসলিম, হাদীস ৫১২৫।
১৩৭. ইমাম ইবন মাজা, হাদীস ৫০।

করবেন না। এ কথা বিশ্ব মুসলিমের সকলকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য 'আবা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে[১৩৮]। অপর হাদীসে আরো বিস্তারিত বলা হয়েছে। ইরশাদ হচেছ ;

عن حذيفة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلواة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجين رواه بن ماجه

হযরত হুযায়ফা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, মহান আল্লাহ বিদআতকারীর কোন আমল কবুল করেন না, না রোযা, না নামায, না সাদাকা, না হজ্জ, না উমরা, না জিহাদ, না নফল, না ফরয। ইসলাম থেকে সে বের হয়ে যায় যেভাবে গোলানো আটা থেকে কোন চুল বের হয়ে থাকে[১৩৯]।

বিদআতীর সংসর্গ থেকে দূরে থাকো

সুহবত ও সংসর্গ মানব জীবনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ভাল মানুষের সংসর্গ ভাল আর মন্দ মানুষের সংসর্গও মন্দ। পবিত্র কুরআনে তাই সত্যবাদী ও পরহেযগার লোকদের সংসর্গে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই শরীঅতের হুকুম হল, কারো সুহবত ও সংসগে যাওয়ার আগে দেখতে হবে যে, সে লোকটি সুন্নাতের পাবন্দ কিনা? সে সুন্নাতের মজবুত অনুসারী কি না। সে সুন্নাতের অনুসারী হলে তার সংসর্গ হবে উপকারী জিনিস। তাতে সুহবত গ্রহণ কারীর মধ্যে সুন্নাতের আমল বৃদ্ধি পাবে ও ঈমান সতেজ হবে। কিন্তু যদি দেখা গেল যে, লোকটি সুন্নাতের অনুসরণকারী নয় কিংবা বিদআতকারী তাহলে সাবধান এমন লোকের সংসর্গ থেকে দূরে থাকা জরুরী। এমন লোকের সংসর্গ বিষাক্ত কাল সাপ থেকেও মারাত্মক। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. পবিত্র কুরআনের নিম্মোক্ত আয়াত;

واذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين

তুমি যখন দেখবে যে তারা আমার আয়াত সমূহ সম্বন্ধে উপহাসমূলক আলোচনায় মগ্ন তখন তুমি তাদের থেকে সরে পড়বে যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু না করে। আর শয়তান যদি তোমাকে ভুলিয়ে দেয় তাহলে স্মরণ হওয়ার সাথেই যালিম সম্প্রদায়ের সাথে আর বসা থাকবে না[১৪০]। এর তাফসীরে বলেন,

دخل فى هذه الاية كل محدث فى الدين وكل مبتدع الى يوم القيامة

এই আয়াতে যাদের সঙ্গে উঠাবসা নিষেধ করা হয়েছে তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত বিদআত সূচনাকারী ও অনুসরণকারী যত মানুষ আসবে সকলেই অন্তর্ভূক্ত আছে। অতএব বিদআত কারীদের সঙ্গে চলাফেরা বা উঠাবসা করা যাবে না[১৪১]।

সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর আরো স্পষ্ট বলেছেন, তিনি রীতিমত লোকদের ধমক দিতেন ও সাবধান করতেন। ইরশাদ হচেছ,

عن ابن عمر رضى الله عنه قال اياكم والسكون الى اصحاب الاهواء فانهم بطروا النعمة واظهروا البدعة خالفوا السنة ونطقوا بالشبهة عليهم لعنة الله والملئكة والناس اجمعين رواه الفردوس فى مسنده

---

১৩৮. শরহু ইবন মাজা, পৃ. ৩৮।
১৩৯. ইমাম ইবন মাজা, হাদীস ৪৯।
১৪০. সূরা আনআম, ৬ ঃ ৬৮।
১৪১. তাফসীরে খাযিন, খ. ১, পৃ. ৫০৯; মাআলিম, খ. ১, পৃ. ৫০৯।

হযরত ইবন উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি তোমরা বিদআতী লোকদের সংসর্গ থেকে সাবধান থাকো। কারণ তারা নিয়মতের নাশোকরি করে, বিদআতকে প্রাধান্য দেয়। তারা সুন্নাহর বিপরীত চলে, অস্পষ্ট বিষয়াদি নিয়ে কথা বলে। তাদের উপর পতিত হোক মহান আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ ও সকল মানুষের লানত[১৪২]।

বিশিষ্ট বুযর্গ হযরত ফুযাইল ইবন আয়াজ রহ. বলেন, বিদআতী কখনো পীর বুযর্গ হতে পারে না। যে কোন গুনাহকে গুনাহ বলেই চিনে না কিংবা মানে না সে নিজেই তো রোগী, সে অন্যদের কি চিকিৎসা করবে। এমনকি যে ব্যক্তি কোন বিদআতীর সাথে উঠাবসা করে মহান আল্লাহ তাকেও দীনের গভীর জ্ঞান ও হিকমত থেকে বঞ্চিত করে দেন।

বিদআত কারীকে সম্মান প্রদর্শন করা যায় না

কোন বিদআতকারীকে বিদআত করার দিক থেকে মূল্যায়ন করে সম্মান প্রদর্শন করা হলে বস্তুতঃ বিদআতকেই সম্মান প্রদর্শন করা হল এবং প্রকারান্তরে বিদআতকে উৎসাহিত করা হল। বিদআত সম্মান বা উৎসাহিত করার যোগ্য জিনিস নয় বিধায় বিদআতীকে সম্মান করা যায় না। তাছাড়া সুন্নাত ও বিদআত একটি অপরটির বিপরীত। তাই বিদআতের সম্মান করা মানে সুন্নাতের অসম্মান করা আর বিদআতকে উৎসাহিত করা মানে সুন্নাত বিলীনের কাজে সহায়তা করা। বিদআত আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নিকট যেহেতু অভিশপ্ত বিষয় সেহেতু বিদআতকারীকে সম্মান দেখানো হলে আল্লাহ তাতে অত্যন্ত নাখোশ হন, তাতে আলাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠে।

ফকীহগণ লিখেছেন যে ব্যক্তি বিদআত করায় অভ্যস্ত এবং বিদআত করে বলে সুপরিচিত তাকে হক্কানী মুসলমানগণ কোন সম্মান দেখানোর অনুমতি নেই। এমন ব্যক্তিকে উপস্থিত হতে দেখে নিজে দাঁড়িয়ে যাওয়া বা তাকে কোন সভা সমিতিতে সভাপতি বানানো বা তার সম্মানার্থে সেবা যত্ন করা সবই নিষেধ।

দুনিয়া ও আখিরাতের সকল সফলতা হল সুন্নাত পালনের মধ্যে। যে ব্যক্তি কিংবা যে সমাজে সুন্নাত যতবেশী প্রতিষ্ঠিত সেই ব্যক্তি ও সেই সমাজ ততবেশী সফল। পক্ষান্তরে সমাজে বিদআতের অনুপ্রবেশ মানে সমাজের ভিতর ধংসের অনুপ্রবেশ। বিদআত উৎসাহিত হওয়া মানে ধংসাত্মক জিনিস উৎসাহিত হওয়া এবং দীনের বুনিযাদ নড়বড়ে হয়ে যাওয়া। যে জিনিস দ্বারা দীনের বুনিয়াদ নড়বড়ে হয়ে যায় সেটি অনুমোদন যোগ্য নয়। এসব কারণে একখানা হাদীসে বিদআত কারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচেছ,

عن ابراحيم بن ميسرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام رواه البيهقى

হযরত ইবরাহীম ইবন মায়সারা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন বিদআতকারীর সম্মান করে সে বস্তুতঃ ইসলামকে ধ্বংস করার কাজে সাহায্য করল[১৪৩]।

বিদআত কারীর তওবা নসীব হয় না

কোন বিদআতকারীর জন্য সবচেয়ে বেশী দুঃখজনক যে বিষয়টি তা হল তার তওবাহীনতা। সে আজীবন ভুলের মধ্যে থাকে। ভুলের কারণে মওত পর্যন্ত বিদআতের গুনাহ বহন করে চলে। অবশেষে তাওবা বিহীন অবস্থায় সেই গুনাহ নিয়েই কবরে গিয়ে পৌঁছে।

মানুষ কমবেশী সবাই গুনাহ করে কিংবা কমবেশী সকলেরই কিছু কিছু গুনাহ হয়ে যায়। পানিতে বাস করে শরীরকে ভেজানো থেকে মুক্ত রাখা কিংবা কাদায় অবস্থান করে পায়ে কাদা লাগতে না দেওয়া

১৪২. মুসনাদে ফেরদাউস, হাদীস ১৫৪৫।
১৪৩. ইমাম বায়হাকী, সূত্র ঃ মিশকাত, ৩১।

যেমন সুকঠিন দুনিয়ায় বসবাস করে সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে নিজকে পরিচছন্ন রাখা তেমনি দুরহ। গুনাহ হয়ে যাওয়া ঠিক নয় কিন্তু গুনাহ হয়ে যাওয়ার চেয়ে বড় অপরাধ হল আমলনামায় গুনাহ বিদ্যমান থাকতে দেওয়া। নিয়ম হল, গুনাহ হয়ে যেতে পারে। তবে যখনই কোন গুনাহ হয়ে যাবে তৎক্ষণাত তওবা করে নিবে। এটিই মুমিন বান্দার আদর্শ। বিদআত কারী এই তাওবা লাভ করতে পারে না। কারণ সে তো বিদআতকে নেক আমল হিসাবেই সম্পাদন করে থাকে। কখনো এটিকে গুনাহ মনেই করে না।

তওবার মূলকথা হল তিনটি। এক. পূর্ণ অনুশোচনা ও লজ্জাবোধ, দুই. কাজটি পুনরায় করার আকাংখা মন থেকে সম্পূর্ণ বিদূরীত করা, তিন. পুনরায় কাজটি করা হবে না মর্মে সুদৃঢ় প্রত্যয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। বিদআতী ব্যক্তির তওবা নসীব হয় না। কারণ বিদআতকারী তার বিদআতকে নেক আমল জ্ঞান করে। বিদআতকে সওয়াব প্রাপ্তির উপকরণ মনে করে। এটিই মহাভুল। এ ভুলের কারণে সে বিদআতকে গুনাহই মনে করে না। কাজেই এ থেকে মনে অনুশোচনা, লজ্জা সৃষ্টি হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। বিদআতকারীর মনে প্রতিষ্ঠিত এই মহাভুলকে হাদীসে 'হিজাব' প্রাচীর বা আড়াল বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইরশাদ হচেছ

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته رواه الطبرانى

হযরত আনাস ইবন মালিক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন যে, বিদআতকারী ব্যক্তি যতক্ষণ না বিদআত পরিত্যাগ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আলাহ জালা শানুহু তার জন্য তাওবাকে প্রাচীর দিয়ে আড়াল করে রাখেন[১৪৪]। (কাজেই সে তওবা করার ইচ্ছা ও মনমানসিকতা থেকেই বঞ্চিত হয়ে থাকে।)

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم اصحاب البدعة ومالاهواء واصحاب الضلالة من هذه الامة يا عائشة ان لكل صاحب ذنب اصحاب الاهواء والبدع ليس لهم توبة رواه ابن ابى عاصم فى السنة

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. হযরত আইশা রা.কে বলে ছিলেন, হে আইশা, মহান আল্লাহর নিম্মোক্ত বাণী;

ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شئ انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون

যারা দীন সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোন দায়িত্ব তোমার উপর নেই। তাদের বিষয় আল্লাহর এষতিয়ারভুক্ত। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন[১৪৫]।

এর দ্বারা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর উদ্দেশ্য হল সে সব লোককে নির্দেশ করে দেওয়া যারা নিজেদের খেয়ালখুশি ও বিদআত অনুসারে চলে এবং যারা গুমরাহ। হে আইশা! এসব গুনাহের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে কতিপয় খাহিশ পুজারী ও বিদআতী। তাদের নসীবে কোন দিন তওবা জুটে না[১৪৬]।

বিদআতী হাউযে কাউসারের পানি থেকে বঞ্চিত থাকবে

রাসূলুলাহ সা.-এর সাথে উম্মতের সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম হল সুন্নাতের অনুসরণ। যে উম্মত সুন্নাতকে মেনে চলে তার সাথে গড়ে উঠে রাসূলুল্লাহ সা.এর রূহানী সম্পর্ক। বিদআত সুন্নতের

১৪৪. তাবারানী, সুত্র ঃ মুনযিরী, হাদীস ৮৩, পৃ. ২১।
১৪৫. সূরা আনআম, ৬ ঃ ১৫৯।
১৪৬. ইমাম ইবন আবূ আসিম, আস সুন্নাহ, হাদীস নং-৪।

বিপরীত বিধায় যারা বিদআতকে পছন্দ করে তাদের সাথে মহানবী সা. এর রূহানী সেতুবন্ধন তৈয়ার হয় না। বরং মওতের পর রাসূলুল্লাহ তাদেরকে নিজের লোক বলে পরিচয়ও দেন না।

হাশরের ময়দানে বিশ্বমানবতা এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন থাকবে। চরম উৎকণ্ঠায় মানুষ কেবল ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী, করতে থাকবে। মানুষ প্রচণ্ড পিপাসার্ত থাকবে। এক ফোটা পানির জন্য পানি চাই পানি চাই বলে চিৎকার করবে। সেদিন মহানবী সা. নিজ হাতে মানুষকে পানি পান করাবেন। মহানবী হাউযে কাওসার নিয়ে বসবেন। যাদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল তিনি যাদেরকে চিনবেন তাদেরকে পানি পান করাবেন। মহানবী সা. নিজ উম্মতকে চিনবেন। উম্মতের যারা সুন্নাত পালন করেছিল তাদের সুন্নাত পালনের স্থানগুলো নূরে জুলজ্বল করবে। এই আলোময়তা দেখেই মহানবী সা. ও আল্লাহ পাকের ফেরেশতাগণ বুঝে নিবেন যে, ইনি মুহাম্মদ সা. এর উম্মত। পক্ষান্তরে যারা দুনিয়ায় সুন্নাত পালনে উদাসীন ছিল কিংবা অবহেলা করেছিল তাদের শরীরে সেই নূর থাকবে না। ফলে তাদেরকে ভীষণ কষ্টের সম্মুখিন হতে হবে।

পক্ষান্তরে উম্মতের যারা সুন্নাতের বিপরীত বিদআতের অনুসরণ করেছে সেদিন তারা প্রিয়নবী সা.এর মুবারক হাতে হাউসে কাউসারের পানি পান করার নসীব তাদের হবে না। তারা দয়াল নবীকে দেখে ছুটে আসবে, মহানবীর কাছে আসতে চাইবে। কিন্তু ফেরেশতাগণ তাদেরকে কিছুতেই মহানবীর নাগালে পৌঁছতে দিবে না। অবশেষে বিষয়টি নিষ্পন্ন করার জন্য স্বয়ং মহানবী সা. অগ্রসর হয়ে আসবেন। ফেরেশতাগণ মহানবী সা.কে তাদের আমলনামা খুলে দেখাবেন যে, এরা দুনিয়াতে ছিল বিদআতী। তারা সুন্নাতকে পছন্দ করেনি, তারা পছন্দ করেছিল বিদআতকে। তখন রাসূলুলাহ সা. নিজেই ফেরেশতাদের বলবেন, এরা বিদআতী, এদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। এদেরকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও। এ মর্মে কয়েকটি হাদীস লক্ষণীয় ঃ

عن عائشة رضى الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهرانى اصحابه انى على الحوض انظر من يرد على منكم فوالله ليقطعن دونى رجال فلأقولن اى رب من امتى فيقول انك لا تدرى ما احدثوا بعدك ما زالوا يرجعون على اعقابهم رواه مسلم

হযরত আইশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. একদা সাহাবীদের মধ্যে ছিলেন। এমন সময় আমি শুনেছি তিনি বলছেন, (হাশরের দিবসে) আমি হাউসে কাউসারের গোড়ায় থাকবো। আমি অপেক্ষায় থাকবো সে সব লোকের যাদেরকে আমার নিকট আসতে দেওয়া হবে। আল্লাহর কসম! সেদিন একদল লোককে আমার পেছনে পথ রোধ করে আটকিয়ে রাখা হবে (আসতে দেওয়া হবে না)। তখন আমি ছুটে গিয়ে বলবো, হে আল্লাহ। এরা তো তালিকা অনুসারে আমারই উম্মত। তাই এদের আসতে অনুমতি দিন। আল্লাহ বলবেন, (না তাদের জন্য কোন অনুমতি নেই। কারণ) আপনি জানেন না, এরা আপনি দুনিয়া থেকে চলে আসার পর আপনার রেখে আসা দীন ও শরীঅতের মধ্যে কী সব বিদআত সৃষ্টি করেছিল। এরা আপনার চলে আসার পর আপনার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল[১৪৭]।

عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى فرطكم على الحوض من مر على شرب ومن شرب لم يظمأ ابدا ليردن على اقوام اعرفهم ويعرفونى ثم يحال بينى وبينهم فاقول انهم منى فيقال انك لا تدرى ما احدثوا بعدك فاقول سحقا سحقا لمن غير بعدى رواه البخارى ومسلم

হযরত সাইল ইবন সাদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, আমি তোমাদের অগ্রণী হয়ে হাউসে কাউসারের গোড়ায় থাকবো, যে আমার কাছে পৌঁছবে সে পান করবে। আর যে একবার এ পানি পান করবে সে পরবর্তীতে কখনোই পিপাসার্ত হবে না। সেদিন আমার কাছাকাছি পৌঁছবে এমন কিছু মানুষ যাদেরকে আমি চিনবো এবং তারাও আমাকে চিনবে। কিন্তু পরক্ষণেই তাদের ও

১৪৭. ইমাম মুসলিম, হাদীস ২২৯৪।

আমার মাঝে আড়াল সৃষ্টি করা হবে। তাদেরকে আমার নিকটে পৌঁছতে দেওয়া হবে না। তখন আমি বলবো, এরা তো আমারই লোক। তাদের পৌঁছতে দেওয়া হোক। আমাকে উত্তর দেওয়া হবে, না না তাদের পৌঁছতে দেওয়া যাবে না। কারণ আপনি জানেন না- এরা আপনার পরে কিসব বিদআতের অবতারণা করেছিল। তখন আমিও বলবো, ঠিক আছে, যারা আমার চলে আসার পর আমার দীন বিকৃত করেছিল তাদের জন্য আমার কোন করুণা নেই। তারা ধ্বংস হোক, হালাক হোক[১৪৮]।

الحمد بعزته وجلاله تتم الصالحات وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين

সমাপ্ত

১৪৮. মিশকাত, পৃ. ৪৮৮।